গিয়েও তুমি যাওনি চলে, আছ মোদের কাছে,
তোমার স্মৃতি ফুলের মত ছড়িয়ে নিতি আছে।
কার্য্য তোমার করব মোরা সমস্ত প্রাণ দিয়ে—
দেব-সাহিত্যের উন্নতি মোরা তোমার আশীষ নিয়ে

সচিত্র নূতন সংস্করণ

ভদ্রাস্ত

উ'৪৭

ষষ্ঠ সংস্করণ

শ্রীমতী ইন্দ্রাণী দেবী

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র

প্রকাশক—শ্রীঅমূল্যরতন বন্দ্যোপাধ্যায়
পরিচালক—"দেব-সাহিত্য-কুটীর"
৫৪।৭, কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

১৩৪৫

প্রিণ্টার—শ্রীবাদলচন্দ্র মজুমদার
"প্যারাডাইস্ প্রেস"
২৩ নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

উৎসর্গ

পূজনীয় অগ্রজ ও অগ্রজ-পত্নী
শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায় ও
শ্রীমতী অমলা দেবী
শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

ফুলদোল,
বৈশাখ, ১৩৩৭।
সাটুই (মুর্শিদাবাদ)।

স্নেহাশ্রিতা
ইন্দ্রাণী

শুভদৃষ্টি—

ডত্তরা—
মনতোষের নিকট পত্র প্রেরণের পূর্ব্বে।

যুবজী সঙ্ঘ গ্রন্থাগার
(স্থাপিত ১৩৫১ সাল)
ঘোষপাড়া, বালী

শুভদৃষ্টি

—০০৩০০—

প্রথম পরিচ্ছেদ

কোন এক দৈনিক সংবাদপত্র-আফিসের সম্মুখে, একখানি পুরাতন রিক্সা-গাড়ী আসিয়া থামিল।

গাড়ীতে এক পঙ্গু জরাজীর্ণ অক্ষম বৃদ্ধ, রিক্সাবাহীর স্কন্ধে দেহ-ভ অর্পণ করিয়া ধীরে ধীরে গাড়ী হইতে নামিলেন। এবং অতি কষ্টে সেই বাহকের সাহায্যেই আফিস ঘরের দরজায় আসিয়া অনুচ্চকণ্ঠে কহিলেন —মশায়, একটিবার ভেতরে যাবো?

উত্তর আসিল—কে আপনি? কাকে চান?

—আমি জনৈক অক্ষম বৃদ্ধ—

আর বলিবার ফুরসৎ মিলিল না, ভিতর হইতে উচ্চকণ্ঠে জবা আসিল—যাও—যাও—এখানে কিছু হবে না। এটা অন্নছত্তর নয়।

—আজ্ঞে আমার বিশেষ দরকার ছিল···কাগজে একটুখানি বিজ্ঞাপ দিতে এসেছিলাম, আজ যদি না হয়, তাহ'লে দেরী হ'য়ে পড়বে, অপে করবার সময় নেই।

গৃহাভ্যন্তরস্থ ভদ্রলোক ঈষৎ নরম হইয়া কহিলেন—ও...আপনি বিজ্ঞাপন দেবেন?...তা...সে তো এ-ঘরে না, অ্যাড্ভারটাইজ্‌মেণ্ট সেক্‌সনে যান্ না। ওখানে গেলেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

—সেটা কোন্ দিকে বাবু? আমি সম্পূর্ণ অক্ষম, পঙ্গু, চলবার শক্তি নেই। যদি দেখিয়ে দিতেন—

—ত্থ'শো দারোয়ান চাকর আছে, জিজ্ঞাসা করুন না, কেন কাজের সময় বিরক্ত করেন?

রিক্সাবাহকের স্কন্ধেই ভর দিয়া, বৃদ্ধ, বিজ্ঞাপন বিভাগের সন্ধানে আরো দু-তিন খানি ঘর পার হইয়া, আসল জায়গায় উপস্থিত হইলেন এবং যথারীতি নমস্কারান্তে, উপবিষ্ট বাবুটিকে আপনার মনোভাব জানাইলেন।

বাবু কহিলেন—মশায়, ব্যবসার জন্যেই তো আমরা ব'সে রয়েছি, তা আবার অত কাকুতি মিনতি কেন? ক'ইঞ্চি বিজ্ঞাপন আপনার—দেখি?

বৃদ্ধ তাঁর ছিন্ন চাদরের এক প্রান্ত হইতে একখানি ভাঁজ করা অর্দ্ধ-মলিন কাগজ বাহির করিয়া, বাবুর হাতে দিতে দিতে বলিলেন—এই নিয়ে পাঁচ জায়গায় পাঁচ জন বাবুকে এই কাগজ টুক্‌রো দেখানো হ'ল। ফল কোথাও পাইনি বাবু!...যদি দয়া ক'রে আপনি—

—"এর আর দয়া কি আছে?" বলিয়া কাগজ খানার লিখিত অংশটুকুতে বারকতক চাহিয়া চাহিয়া বাবুটি কহিলেন—প্রায় দু'ইঞ্চি... কিন্তু ক'দিন ছাপ্‌তে হবে?

বৃদ্ধ করযোড়ে কহিলেন—সে আপনার দয়া!

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বাবু কহিলেন—দয়া দয়া করছেন কেন মশায়?

বলি বিনি পয়সায় কাজ হাঁসিল করতে এসেছেন নাকি? বলিয়াই হো হো শব্দে হাসিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধ কিন্তু পূর্ব্ববৎ যোড়করেই বলিলেন—চার জায়গায় অপমান পুরস্কার পেয়ে আপনার কাছে এসেছি, যার দু'বেলা অন্নসংস্থান হয় না, তার কাছে কি টাকা থাকে বাবু?

বাবুটি লিখিত কাগজ খানার প্রতি একদৃষ্টে চাহিতে চাহিতে বলিলেন—মেয়েটি কার? আপনার?

—আজ্ঞে,...পাঁচ বছরের সময় মার মাথা খেয়েচে। আজ তের বছর-কাল আমিই তাকে বুকে করে রেখেছি। মরবার সময় হ'য়ে এলো, কখন ডাক আসে তার ঠিক ঠিকানা নেই, হতভাগীকে যে কার কাছে রেখে যাবো—সেই ভাবনা ভেবে ভেবেই...

বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কি করেন?

বৃদ্ধ আপন দেহের প্রতি বাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করাইয়া কহিলেন—এই কি কিছু করবার মত দেহ বাবু? কি আর করবো, চব্বিশ ঘণ্টাই শুয়ে বসে কাটাই। ঘরের জিনিষপত্তর জলের দামে বেচি আর পেট ভরাই।

বাবুটি চিন্তিত হইলেন।

বৃদ্ধ বলিলেন—চল্‌বার শক্তি নেই, ট্যাঁকে কড়ি নেই, সুতরাং উপায় বল্‌তেও আমার কিছু নেই। হয় তো খোঁজার মত খুঁজ্‌তে আমি পারিনি। যদি সংবাদপত্রের অনুগ্রহ পাই, আশা হচ্ছে ভবিষ্যতে সুফলই প্যাবো।... এখন আপনাদের দয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই।

বাবুটি কহিলেন—এক কাজ করবেন?

—আদেশ করুন।...সত্যি বল্‌ছি বাবু! এমন ভাল কথায় অনেক দিন লোকে আমার সঙ্গে আলাপ করেনি

—মেয়েটির বয়স কত বল্‌লেন ?

—আঠারো।

—দেখতে ?

—আমি বাপ, নিজের মুখে বল্‌লে কি আপনি বিশ্বাস করবেন ?

—হ্যাঁ, আপনার কথাতেই আমার বিশ্বাস হবে।

—সে আমার পরমা-সুন্দরী, রূপে গুণে—সকল দিকেই।

—বেশ, আমার এক দূরসম্পর্কীয় ভাইপো আছে, তাকে জামাই করবেন ?...

—সে সৌভাগ্য কি আমার ভাগ্যে আছে বাবু ?...আপনি যদি অনুমতি করেন, তাহ'লে নিশ্চয়ই করবো !

—"বেশ, আপনার কথায় আমি সন্তুষ্ট হ'লাম। আপনার সরলতারও প্রশংসা করছি।...জিনিসপত্তর এখনো যা কিছু ঘরে আছে, সে সব আর খোয়াবেন না। যা আছে তা থাক্, আপনার মেয়ে-জামাই ভোগ করবে।"...বলিয়াই বাবুটি হাঁকিলেন—ওরে বেয়ারা ! রাজু বাবুর ঘর থেকে পঞ্জিকা নিয়ে আয় তো।...দিন করে ফেলা যাক্ কেমন ?

বৃদ্ধ মাথা চুল্‌কাইতে লাগিলেন।

বাবু হাসিয়া কহিলেন—আপনার কপাল ভালো, মশায় ! এলেন বিজ্ঞাপন দিতে, কিন্তু মিলে গেল যার জন্যে হয়রান্ হ'য়ে পড়েছেন—তাই। তা আপনার নামটি জিজ্ঞাসা করতে পারি ?

—আমার নাম রঘুনন্দন দেবশর্ম্মা, উপাধি মুখুয্যে। আমরা কামদেব পণ্ডিতের সন্তান।

—বেশ বেশ, সুসংবাদ। আমাদের ছেলেটিও ঠিক আপনার পাল্টা ঘর। খুব সুন্দর হবে।...

ইতিমধ্যেই পঞ্জিকা আসিল। বৃদ্ধ রঘুনন্দন বিনীতভাবে কহিলেন—ছেলেটিকে একটিবার চাক্ষুষ না ক'রে—

বাবু আবার হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন—খুঁজে খুঁজে হয়রান হ'য়ে, দুনিয়ার লোকের পা ধুয়ে খোসামোদ করে মরতে ব'সেছেন তবু আপনার সখ্ গেল না ?···বিয়ে হ'লেই তো বেঁচে যাবেন। আবার ছেলে দেখার রোগ কেন ?···তা বেশ, দেখাচ্ছি। সে আমাদের এখানেই চাকরী করে। ব'সে খায় না মশায় ! বুঝলেন ?—ব'সে ব'সে ঘরের অন্নধ্বংস করে না। উপার্জ্জনক্ষম ছেলে। কারুর ভরসায় সে বিয়ে করছে না। ...এক্ষুনি দেখতে চান্ ? ডাক্‌বো তাকে ?

রঘুনন্দন নীরব রহিলেন। বাবুটি পুনরায় বলিতে লাগিলেন—না না চুপ-চাপ থাকার সময় নয়। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ—[illegible] ছেলে-খেলা নয়, যখন মনে একবার খট্‌কা লেগেছে, তখন ও [illegible] ভঞ্জন করাই দরকার। বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিয়েই তো সংসার। অবিশ্বাসের মন দিয়ে কোন কাজই পাকা হ'তে পারে না।...তা হ'লে ডাকি ?

রঘুনন্দন বিনীত অথচ গম্ভীর ভাবে বলিলেন—আপনি কি মনে করছেন যে, আমি আপনাকে অবিশ্বাস করছি ?

—না না, সে সব মনে করবো কেন ? তবে আমাকে অবিশ্বাস না করুন, আমার কথাকে করছেন—এ ধ্রুব !···তা আপনি এত কিন্তু হচ্ছেন কেন ? যার হাতে মেয়ে দিতে চাচ্ছেন, তাকে সত্য-সত্যই আপনার দেখা দরকার।

রঘুনন্দন বলিলেন—এখানে এ অবস্থায় আজ বরং থাক্। যদি অনুগ্রহ ক'রে আমাকে ভরসা দেন, তাহ'লে—

উৎসাহিত ও আনন্দিত হইয়া বাবুটি কহিলেন—আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে।—আপনিই একদিন আমাদের ওখানে যাবেন। কিন্তু সে কি সম্ভব হবে? আপনার এই অসহায় অবস্থা দেখে আর তো কষ্ট দিতে ইচ্ছা হচ্ছে না।—আচ্ছা এক কাজ করুন, ...কাল বাদ পরশু দিন বিকেল বেলা, আমরাই আপনার বাড়ীতে যাবো। আপনাকে আর মিছি মিছি কষ্ট পেতে হবে না। কিন্তু মনে রাখ্‌বেন,—একটি পয়সাও যদি আমাদের জন্য খরচা করেন, তাহ'লে বিয়ে দিতে রাজী হব না। এক পয়সার পান পর্য্যন্ত কিন্‌বেন না। আপনার ওখানে ব'সেই দিন করা যাবে।...বাস্তবিক আপনার কথাই ঠিক। মেয়েটীকেও তো একটিবার আমাদের পক্ষ হ'তে দেখা উচিত।

রঘুনন্দন পরম আপ্যায়িত হইয়া বলিলেন—আমার পরম সৌভাগ্য কিন্তু ছেলে দেখার ব্যবস্থা?

—কেন ছেলেকেও আমরা সঙ্গে নিয়ে যাবো। বর-কনে দু'জনেই দু'জনকে দেখ্‌তে পাবে।···ব্যবস্থা ভালই হ'ল।

রঘুনন্দন্ কহিলেন—পরশু দিন বিকেলের দিকে?

—হ্যাঁ। একদম পাকা কথা দিলাম।

—যে আজ্ঞে।...কিন্তু এই বিজ্ঞাপনটা তা হ'লে আর দোব না?

—কি দরকার? তবে দিলে যদি আপনি খুশী হন, বেশ, দিচ্ছি পাঠিয়ে।...

—তবে থাক্। আপনাকে আমি আজ থেকে পরমাত্মীয় জ্ঞান করছি। যা আপনার অভিরুচি হয়, তাই করবেন।

বাবুটি অন্যমনস্ক ভাবেই বিজ্ঞাপনখানি ছাপিবার ঘরে পাঠাইয়া দিলেন। উপরে লিখিয়া দিলেন—'চ্যারিটি'...

তারপর, রঘুনন্দন তাঁহার রিক্সাবাহকের সাহায্যে পুনরায় রিক্সায় চাপিয়া, বাটীর দিকে রওনা হইলেন।...

তখন ঘনায়মান সন্ধ্যা—কলিকাতার বুকে আলোক-সজ্জার আয়োজন করিতেছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বেলেঘাটার একখানি খোলার বাড়ী। অবস্থা শোচনীয়। জানালা-কপাট ভগ্নাবস্থায় কোনরূপে খাড়া আছে মাত্র।

কিন্তু জীর্ণ ক্ষুদ্র কুটীর হইলেও, তাহার ভিতর-বাহিরের পরিচ্ছন্নতা দেখিলে অধিবাসীর উপর দরদ আসে।

বাহিরের একটি ছোট রকের উপর কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বলিতেছিল এবং তাহারই অনতিদূরে বাড়ীর মতই জরাজীর্ণ একখানি মাতুরের উপর দুইটি ভদ্রলোক বসিয়া গল্প করিতেছিল।

গৃহমধ্যে বসিয়া এক কিশোরী;—রূপের প্রভায় তার জীর্ণ কুটীরে আলোর জোয়ার আসিয়াছে!

এই বাড়ীই রঘুনন্দন মুখুয্যের, এবং এই কিশোরী বালা-ই তাঁর অবিবাহিতা কন্যা উত্তরা।

ভদ্রলোকদ্বয় উভয়েই যুবক। কিন্তু উত্তরার সম্পূর্ণ অপরিচিত। আজ অপরাহ্নে রঘুনন্দন বাটী হইতে প্রস্থান করিবামাত্রই ভদ্র-লোকদ্বয় তাঁহারই নাম করিয়া দরজায় যখন ডাকাডাকি করিতেছিল, তখন একলাঘরের একলা মেয়ে উত্তরা সাড়া না দিয়ে থাকিতে পারে নাই। তারপর দরজা খোলা পাইয়া, ভদ্রলোকেরা বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং উত্তরাকে জানাইয়াছে—মুখুয্যে মশায়ের সঙ্গে বিশেষ জরুরী

কথা আছে, দেখা হওয়া চাইই, তিনি যখনই বাটী ফিরুন না কেন, অপেক্ষা করিতে হইবে।

অগত্যা ভদ্রতার খাতিরে উত্তরা তাহাদের বসিবার জন্য যথারীতি ও যথাসাধ্য আসনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে, কিন্তু তাহার পর হইতে আর সে ঘরের বাহিরে আসে নাই, লজ্জায় আসিতে পারে নাই।

দুজনের একজন হঠাৎ উত্তরার ঘরে আসিয়া কহিল—তোমার বাবা কি আজ আস্‌বেন না না কি?

উত্তরা মাথা নত করিয়া রহিল,—কোন জবাব দিল না।

যুবক কহিল—মুখের কথাটাই বের করনা ছাই। আর কতক্ষণ ব'সে থাক্‌বো? দু'ঘণ্টারও বেশী হ'য়ে গেল যে।

উত্তরা নিরুপায় ভাবেই বলিল—তিনি কখন ফিরবেন, সে কথা আমায় ব'লে যান্‌নি। তবে বেশী দেরী হবে না বলেই আমি জান্‌তাম ...আপনাদের কি দরকার, কাগজে লিখে রেখে গেলে, আমি তাঁকে দেখাবো।

যুবক ঈষৎ হাসিয়া বলিল—লেখালেখির কাজ নয় গো, লেখালেখির কাজ নয়। মৌখিক আলাপ হওয়া প্রয়োজন।

উত্তরা আর কোন কথা বলিল না।

যুবক কহিল—কথা কি জানো?...বিয়ের কথা! বুঝ্‌লে?

উত্তরা তার মুখখানা অনেকখানি নীচু করিয়া বসিল, একটাও কথা ছিল না।

যুবক কহিল—বলি চুপ করে রইলে কেন? বিয়ের ঠিকঠাক হ'য়েচে কোথাও? সম্বন্ধ এসেছিল নাকি?

উত্তরা মাথা নাড়িয়া জানাইল—না।...এই সঙ্কেতটুকু না করিলে,

তাহার উপায় ছিল না। আজ পর্য্যন্ত কত লোক যে কতভাবে তাহাকে কত কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছে, তাহার অক্ষম পিতাকে কত ভরসা দিয়া, নিমেষের জন্যও আর ফিরিয়া আসে নাই, সে সব কথা ভাবিলে উত্তরার বুকের রক্ত হিম হইয়া আসে! জীবন ধারণের আশা, নিরাশায় নিমজ্জিত হয়।

যুবক কহিল—দেখ, তোমার কিন্তু ভয়ানক লজ্জা। বয়েস হ'য়েছে, এখন কি আর লজ্জা মানায়?...মুখুয্যে মশায়ের যা অবস্থা, তাতে তোমার অভিভাবক তুমি নিজেই।...বলি কিছু ব'লবে? আমাকে তোমার পছন্দ হয়? তোমার মুখের কথা না পেলে, তোমার বাবার সঙ্গে আমি মোটেই কথা কইবো না; যদি বলো যে, আমাকে তোমার পছন্দ হচ্ছে না, তাহ'লে কেন আর মিছিমিছি এখানে ব'সে থাকি। বলি বিয়ে তো আর তোমার বাবার সঙ্গে নয়...

উত্তরার নমিত মুখখানা সহসা আরো নমিত হইয়া গেল।

যুবক পুনরায় বলিল—সত্যি কথা ব'লতে কি, তোমাকে দেখেই আমি প্রতিজ্ঞা করেছি—তুমি ছাড়া জীবনে আর কারুর সঙ্গেই যেন আমার বিবাহ না হয়; শুধু আমি কেন, যে একবার তোমার ঐ রূপ চোখে দেখেচে, সে কদাচ অন্য নারীতে—

উত্তরা ঈষৎ বিরক্তির সুরে বলিয়া উঠিল—আপনি বাবার সঙ্গে কথা ব'ল্‌বেন। বাইরে গিয়ে বসুন, তিনি এলেন ব'লে।

যুবক বাহিরে তো গেলই না, উপরন্তু উত্তরার আরো নিকটে সরিয়া আসিয়া বলিল—আমি তো আগেই ব'ললাম, তোমার পছন্দ হ'ল কি না শুধু ঐটুকুই আমি জান্‌তে চাই। তুমি যদি 'না' বলো, কেন তবে তোমার বাবাকে বিরক্ত কর্‌বার জন্যে ব'সে থাক্‌বো?

উত্তরার মুখে সেই এক কথাই,—আপনি বাবাকে সব কথা ব'লবেন।

(যুবক ধীরে ধীরে উত্তরার একখানি হাত চাপিয়া ধরিতেই, উত্তরা ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া দু'তিন হাত পিছাইয়া ঘরের মেঝেয় পড়িয়া গেল, এবং তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—যান আপনি,—এখুনি যান)

যুবক বলিল—তোমায় পছন্দ?

দু'হাতে মুখ চাপিয়া, উত্তরা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—না—না—না।

ঠিক সেই সময়েই দরজার বাহিরে আসিয়া রঘুনন্দন ডাকিলেন—উত্তরা!

যুবকেরা উভয়েই তাড়াতাড়ি উঠানে নামিল এবং একজন দরজা খুলিয়া কহিল—এই যে মুখুয্যে মশায়! আমরা প্রায় ঘণ্টা তিনেক ধরে আপনার অপেক্ষায় ব'সে রয়েচি।

রিক্সাবাহক ধীরে ধীরে রঘুনন্দনকে দাওয়ার উপর বসাইয়া দিয়া উত্তরাকে ডাকিল—দিদিমণি! পয়সা মিল্‌বে?

উত্তরা ঘরে বসিয়াই জবাব দিল—সকালে।

...রঘুনন্দন আগন্তুক যুবকদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনারা আমার অপেক্ষায় এখানে ব'সে আছেন, অথচ আমি তো আপনাদের চিন্‌তে পার্‌লাম না!...দয়া ক'রে বলুন—কি দরকার?

আপনার মেয়েটিকে দেখ্‌তে এসেছিলাম।...চরকডাঙ্গার গোবিন্দ বাবুর মুখে শুন্‌লাম—মেয়েটি পরমাসুন্দরী...

রঘুনন্দন কহিলেন—ঐ পর্য্যন্তই। পরমা সুন্দরী হলেও পয়সা অভাবে মহা কুৎসিতা। আপনাদের নিয়ে দ্বাদশ জন ভদ্র ব্যক্তি আমার মেয়েকে পছন্দ কর্‌তে এসে ফিরে গেছেন।...

—ব্যাপার কি বলুন তো ?…ফিরে গেলেন কেন ?

—অর্থহীন ব্রাহ্মণের অভাগী কন্যা, কে তার ভার নেবে? কে তাকে গৃহলক্ষ্মী কর্‌তে রাজী হবে ?

যুবক দুইটির মধ্যে যে উত্তরার সহিত কথা বলিয়াছিল, সে বলিল—রূপে যার ঘর আলো হয়, তার মত ভাগ্যবতী আর কেউ নেই। পয়সাই কি সংসারের সব? আমি রাজী আছি, যদি দয়া ক'রে আপনি সব পাকাপাকি কর্‌তে চান, আমি বিয়ে কর্‌তে প্রতিজ্ঞা কর্‌লাম।

বিস্মিতভাবে যুবকের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে করিতে রঘুনন্দন কহিলেন—তোমার বাড়ী কোথা ? এই বেলেঘাটায় ?

—না, হাওড়াতে।

—কিছু মনে কোরোনা বাবা ! একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি ?

—স্বচ্ছন্দে, একটি কেন দু'দশটি কথা বলুন !…কথায় বলে লাখ্ কথা না হ'লে বিয়ে হয় না। তা আপনি তো—

—কি করা হয় তোমার ?

—আমি মোটর-ড্রাইভারি করি। ট্যাক্সির,…মাসে খুব কম পক্ষে আমার একশো টাকা ইন্‌কাম।…মেয়ে দেখে আমাদের খুবই পছন্দ হ'য়েচে, একটি পয়সাও আপনাকে খরচা করতে হবে না। বিনা পণে…

রঘুনন্দন ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিলেন—পণ দেওয়ার মত ক্ষমতাই যখন আমার নেই, তখন বিনা পণ ছাড়া আর গতি কি ?… যেখানেই হোক, বিনা-পণ ভিন্ন আমার আর গত্যন্তর নাই। কিন্তু কি ব'ল্‌লে বাবা ?—মোটর-ড্রাইভারি করো ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। মাসে একশো টাকা ইন্‌কাম্।

—কিন্তু আমায় পাগল ভাবো নি' তোমরা ?...একশো টাকা ইন্‌কাম্‌ ! ··আমার মেয়েকে তুমি—

—আজ্ঞে হ্যাঁ, বিয়ে করবো এই আমিই।—প্রতিজ্ঞা ক'রেছি।

গৃহাভ্যন্তর হইতে উত্তরা ডাকিল—বাবা !

রঘুনন্দন কন্যার আহ্বানে সাড়া দিলেন মাত্র, কিন্তু পঙ্গু—অসহায় তিনি, উঠিয়া যাওয়ার সামর্থ্য নাই !

উত্তরা ঘরে থাকিয়াই কহিল—ওঁ-দের যেতে বলো বাবা !

হঠাৎ রঘুনন্দনের স্মরণ হইল—এই মাত্র সংবাদপত্র-আফিসে বসিয়া তিনি অন্য এক সম্বন্ধ পাকা করিয়া আসিয়াছেন। আবার ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া আগন্তুক যুবকদ্বয়কে বলিলেন—আজকের মত এ আলোচনা বন্ধ থাক। আমি বড় ক্লান্ত। আপনারা দিন পাঁচ ছয় পরে আস্‌বেন।

যুবকদের একজন কহিল—কিন্তু এর মানে কি মুখুয্যে মশায় ?—গোবিন্দ বাবুর মুখে আপনার তো অজস্র প্রশংসা শুনে এলাম—

বিনীত হইয়া রঘুনন্দন কহিলেন—গোবিন্দ বাবু আমার উপর অসীম অনুগ্রহ ক'রেছেন। নইলে প্রশংসা পাওয়ার যোগ্যতা কি আমার আছে বাবা ? যার হাত-পায়ে শক্তি নেই, সে দুনিয়ার লেন্‌-দেন্‌ ব্যাপারে কী করতে জানে ?...মেয়েটার মেজাজ বড় ভাল নেই। তার সঙ্গেও আমার পরামর্শ আছে।

যুবকদ্বয় আর কিছু না বলিয়া, বিরক্তভাবে নয়, অনেকখানি ক্ষুন্ন হইয়া প্রস্থান করিল।...

...উত্তরা ধীরে ধীরে আসিয়া পিতার পায়ের কাছে বসিল।

রঘুনন্দন জিজ্ঞাসা করিলেন—কি ব'লছিলি মা ? ওরা কি তোর সঙ্গে মন্দ ব্যবহার করেছিল ?

উত্তরা ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিল—মন্দ ব্যবহার তো আমরাই ষোল আনা দেখাচ্ছি বাবা!—সংসারে গরীব হ'য়ে আসাটাই বুঝি সব চেয়ে অপরাধ। কিন্তু কেন?—তারও জবাব খুঁজে পাই না।

রঘুনন্দন ম্লান হাসি হাসিয়া কহিলেন—ব্যাপার কি জানিস মা?… এ দুর্ভাগ্য তোকে সইতেই হ'বে। কারণ তুই আমার মেয়ে! তোকে সংসারে এনেছি, সুতরাং আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে তুই-ও আইনতঃ দায়ী!…এ আইন সংসারের নয় মা—মনুষ্য-জীবনের।… কিন্তু ভগবান তোর যেমন, বড় লোকেরও তেমনি। তাঁর কাছে ধনী-নির্ধনে শ্রেণী-বিভাগ নেই উত্তরা!

উত্তরা অন্যমনস্ক ভাবে কি বলিল—রঘুনন্দন বুঝিতে পারিলেন না। কন্যার মুখের ভাব দেখিয়া তাঁহার মুখেও ভাবান্তরের ছায়া আসিতেছিল।…

বাপ ও মেয়ের নীরবতার মধ্য দিয়া রাত্রি বাড়িয়া চলিল, কিন্তু আহারের কথা কাহারও মনে পড়িল না। মানুষের মস্তিষ্ককে মৌচাক বানাইতে পারে—শুধু চিন্তাই!—দুশ্চিন্তার দারুণ বিভীষিকা!…

…রাস্তার কোলাহল কমিয়া গেছে, বরফওয়ালার চীৎকার ছাড়া আর কোন ফিরিওয়ালার আওয়াজ শোনা যায় না।

হঠাৎ উত্তরার চমক ভাঙিল!—তাহার অশ্রুসিক্ত নয়নের সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টি ক্ষুধিত পিতার মলিন মুখের উপর ন্যস্ত হইতেই, তাহার অন্তরটুকু ফুকারিয়া উঠিল।—তাহার দুর্ব্বল পিতা অনাহারে!

ডাকিল—বাবা!

ক্লান্ত রঘুনন্দনের তন্দ্রা আসিয়াছিল। তিনি বসিয়া বসিয়াই ঝিমাইতেছিলেন।

রোগের যাতনা মানুষকে তার সকল সুখ-দুঃখের অবস্থা ভুলাইয়া দেয়। চিররোগীর ক্লান্তিতেও, সাংসারিক শোক-সান্ত্বনায় বিস্মরণীর প্রলেপ লাগে!

উত্তরা আবার আস্তে ডাকিল—বাবা!

রঘুনন্দন চমকিত হইয়া সাড়া দিলেন—কি মা? ডাকছিলি?

—কি খাবে বাবা?...ভাত তো হয়নি আজ। ও-রা সেই বিকেল থেকে ব'সে ছিল, আমি রান্না করতে সুযোগ পাইনি।

রঘুনন্দন কহিলেন—আমার না খেলেও চ'লে যাবে উত্তরা! কিন্তু তুই?

—"আমারও চ'লবে বাবা!···কিন্তু তোমার যে চ'লবে না, তা আমি ঠিক ব'লছি।"—বলিয়াই উত্তরা ঈষৎ হাসিল।

—পাগ্‌লি কোথাকার!···

—সত্যি বাবা।—তুমি যে মোটেই খিদে সইতে জানো না। এখন ক'টা বেজেছে জানো?—বারোটা।

—ওঃ এতক্ষণ ব'সে রয়েচিস্?...কিন্তু ঘরে যদি আর কিছু থাকে, তাই খেয়ে নে উত্তরা!···আমার সত্যিই আজ খিদে পায়নি। বারোটার পর এ বয়েসে আর কিছু পেটে সইবে না।...কিন্তু ঐ ভদ্রলোক দু'টোর সঙ্গে কি তোর বচসা হ'য়েছিল উত্তরা? তখন অমন ধারা রেগে উঠেছিলি যে?···

উত্তরা মুখ নীচু করিয়া কহিল—ও-সব কথা আর ক'য়ো না বাবা! তাদের দোষ কি? দোষ আমাদেরই। তুমি অসহায়, আমি তোমার মেয়ে, সুতরাং আমারও সহায়-সম্বল নেই। দুর্ব্বলকে রাস্তার কুকুর-বেড়ালেও তাড়া করে বাবা!...ও-রা তো মানুষের আকার ধরে এসেছিল।

…কিন্তু আর কোনদিন ও-দের বাড়ী ঢুকতে দিয়ো না বাবা!… তোমাকে তো কতদিন ব'লেছি বাবা!—অদৃষ্ট ছাড়া পথ নেই!

রঘুনন্দন চিন্তিত হইলেন।

উত্তরা বলিল—সারাদিনটাই তো ঘুরে বেড়িয়েছ। চলো বাবা, তোমাকে শুইয়ে দিই…আর এই অনর্থক ঘোরা-ঘুরি করে কাজ নেই বাবা! তুমিই যে সংসারের সব আমার!…আমাকে অকূলে ভাসিয়ো না বাবা!…তুমি যদি অসুখে পড়ো, তা হ'লে যে সে এসে আমাকে অপমান করে যাবে।…

…কন্যার সাহায্যে শয্যায় শয়ন করিয়া, রঘুনন্দন কহিলেন—আজ খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে গিয়ে, খুব ভাল রকম একটা সম্বন্ধ করে এসেচি মা!…পরশু দিন তাঁরা ঠিক-ঠাক করতে আসবেন।

উত্তরা কথা কহিল না।

রঘুনন্দন বলিলেন—তোর যিনি শ্বশুর হবেন, অবিশ্যি আপন-শ্বশুর নয়, তিনি মানুষ নন্—দেবতা। অমন সদানন্দ পুরুষ…

ক্ষীণ হাসি হাসিয়া উত্তরা বলিল—সদানন্দ পুরুষ তো আজ পর্য্যন্ত তোমার চোখে বড় কম ঠেকলো না বাবা। এঁ-কে নিয়ে ক'জন হবে?—মনে আছে?

দৃঢ়কণ্ঠে রঘুনন্দন বলিয়া উঠিলেন—ভগবান যদি দুনিয়ার মায়া না ছেড়ে থাকেন, তা হ'লে এবারকার সম্বন্ধ হাতছাড়া হবে না মা!… চন্দ্র-সূর্য্য যদি আকাশে ওঠে, তা হ'লে তোর আসল ঘর সেই বাবুটির দয়াতেই ঠিক হ'বে। আমি যজ্ঞোপবীত ছুঁয়ে ব'লতে পারি।

তাড়াতাড়ি উত্তরা বলিয়া উঠিল—বামুন হ'য়ে, ও জিনিষটাকে অসম্মান দেখিয়ো না বাবা। পাপের আর শেষ-সীমা থাকবে না। তা

ছাড়া বামুন হ'য়ে দুনিয়াকেও অভিশাপ দিয়ো না! ভগবান যদি তার ক্ষমতা ছাড়েন তা'হলে থাকবে কি? অসংখ্য প্রাণী বাঁচবে কেমন করে?

—তবে কি তুই আমার কথা অবিশ্বাস করলি উত্তরা?

উত্তরা ক্ষুব্ধস্বরে বলিল—তোমার পায়ে পড়ি বাবা! রাত কি আর আছে? ঘুমোও।

—কিন্তু আমার কথা বর্ণে বর্ণে সত্যি মা! এতটুকু মিথ্যে নয়।··· আচ্ছা আর তো মাঝে ক'টা দিন। দেখ্‌বি আপন চোখে।...

উত্তরা কহিল—আমার ভয়ানক মাথা কামড়াচ্ছে বাবা! কথা কইতে কষ্ট হয়, বকিয়ো না আমাকে।

গ্রন্থাগার
ঘোষপাড়া

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কথিত দিনে, সংবাদপত্র-আফিসের বাবু নিরঞ্জন সরকারের গাড়ীখানা যখন রঘুনন্দনের বাড়ীর সম্মুখবর্ত্তী গ্যাস-পোষ্টের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন দিনান্তের ক্ষীণ সূর্য্যরশ্মি পৃথিবীর বুকে বিদায় মাগিতেছিল।

নিরঞ্জনবাবু গাড়ীর ভাড়া মিটাইয়া দিয়া অগ্রসর হইলেন, তাঁহার সঙ্গে আরো তিনজন ভদ্রলোক।

রঘুনন্দন প্রাতঃকাল হইতে প্রতীক্ষা করিয়া করিয়া এতক্ষণে দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া ভগবানের উপর ভবিষ্য-ফলাফল সঁপিয়া দিয়াছেন এবং কন্যার নিকটেও অনেক খানি উপহাসাস্পদ হইয়াছেন। এক ভগবান ছাড়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নালিশ জানাইবার লোক যদি তাঁহার একজনও থাকিত, তাহা হইলে একান্ত চলচ্ছক্তিহীন এই জীর্ণ দেহটার মায়া তিনি সেই বিচারকের পদতলেই খণ্ড খণ্ড করিয়া দিয়া দুর্নিবার জ্বালার অবসান করিতে পারিতেন। কিন্তু দুঃখের প্রধান কারণ—ভগবানকে দেখা যায় না এবং অন্তর্যামী হইয়াও তিনি প্রত্যক্ষীভূত নহেন।···

উত্তরা সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়া তুলসী মঞ্চের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, এখনও প্রদীপ রাখিয়া প্রণত হয় নাই, এমনি সময় বাহির হইতে নিরঞ্জন বাবু ডাকিলেন—রঘুনন্দন বাবু আছেন না কি?

অমঙ্গলের পূর্ণ নিদর্শন দেখাইয়া, উত্তরার হস্তস্থিত সন্ধ্যাদীপ সশব্দে পড়িয়া গেল।

রঘুনন্দন সজীব—সুস্থ হইয়াও চিররুগ্ন, যেহেতু এক পা-ও তাঁর নড়িবার ক্ষমতা নাই। বাহিরের ডাক শুনিয়া, তারস্বরে কহিলেন—আসুন! আসুন! আসতে আজ্ঞা হয়!...তারপর কন্যাকে বলিলেন—দরজাটা খুলে দিস মা উত্তরা।

উত্তরা তখন নতজানু হইয়া তুলসী-বেদীমূলে উপবিষ্টা। তার নয়নে দরবিগলিত ধারা, উভয় হস্ত যুক্তাবস্থায় বক্ষোপরি সংস্থাপিত। কণ্ঠের মূক ভাষা মূক থাকিয়াই ক্লিষ্ট অন্তরের ব্যথার কথা গাঁথিয়া গাঁথিয়া দেব-চরণোদ্দেশে সমর্পণ করিতেছিল—হে বিশ্ববিপদহন্তা সর্ব্বসন্তাপহারী মধুসূদন! আমার অন্তরের ব্যথা তো তোমার অজ্ঞাত নাই প্রভু! সংসারের শোক-দুঃখ-যাতনার জাল হইতে আজ আমাকে মুক্তি দাও!

ওদিকে নিরঞ্জনবাবুর ডাকের মাত্রাটা ক্রমশঃ চড়া পর্দ্দায় উঠিতেছিল।

রঘুনন্দন বিরক্ত ভাবে বলিলেন—একটু তাড়াতাড়ি সেরে নে বাছা! ভদ্রলোক কি আমাদের হাতধরা যে, বার-দরজায় খাড়া থাক্‌বে?

উত্তরা চোখ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। নিভন্ত প্রদীপটা পায়ে ঠেকিতেই সে অজ্ঞাত আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিল! ভয়ে এবং দারুণ লজ্জায় অভিভূত হইয়াও সে কোন রকমে দরজা খুলিল।

একজন দুইজন করিয়া চারজন লোক বাড়ীতে প্রবেশ করিতেই রঘুনন্দন ব্যগ্র কণ্ঠে ডাকিলেন—ওরে উত্তরা! শীগ্‌গীর বসতে জায়গা দে, শীগ্‌গীর আয়।

উত্তরার লজ্জা রাখিবার আর ঠাঁই নাই, কিন্তু এই লজ্জাও আজ তাহার কাছে লজ্জাবশতঃই পরাভব স্বীকার করিতেছিল। বেচারী কোন রকমে গৃহ হইতে একখানি জীর্ণ সতরঞ্চি বাহির করিয়া, নাতিক্ষুদ্র দাওয়ায় বিছাইয়া দিল; তারপর ক্ষিপ্রগতিতে আলো জ্বালিল

রঘুনন্দন অতিথিবর্গের আদর-অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন, এবং বামহস্তে চক্ষুমার্জ্জনা করিতে করিতে আপন মনেই বলিলেন—এমন অভাগী বোধ হয় দুনিয়ায় আর একটিও নেই! আজ এমন দিনে, ভাল করে চুল ক'টা গুছিয়ে দিতে পারে তেমন আত্মীয়ও তার খুঁজে মেলে না; তারপর কন্যাকে বলিলেন—একখানা ভাল কাপড় প'রে ফেল্ উত্তরা!···এঁদের সব প্রণাম করতে হবে।

উত্তরার মুখের মধ্যে হাসি আর রাগ দুই-ই একসঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে!...বাবার বুদ্ধি শুদ্ধি এমন ধারা লোপ পাইতে পারে—তা কি সে স্বপ্নেও কোনদিন কল্পনা করিয়াছিল!...ভাল কাপড়!···হায়রে পোড়া বরাত!—ভাল হইবার মত কোন কিছুই যার সম্বল নাই, আজ ভাল কাপড় সে কোথায় পাইবে?...পেটের দায়ে যাহাদের লেপ-তোষক অবধি বেচিতে হয়, তাহাদের পরিধেয় থাকিবে কোন্ হেতুতে?

কিন্তু নিরঞ্জন বাবুই আজ এহেন নিদারুণ সঙ্কটে উত্তরাকে মুক্তি দিলেন। কহিলেন—থাক্ মা! এম্‌নি এম্‌নি তোমাকে আমরা আশীর্ব্বাদ করে যাবো! কাঙালের ঘরে অন্নপূর্ণা জগদ্ধাত্রী মা আমার সম্পদ লুকিয়ে কাঙালিনী সেজে র'য়েচে!···এ রূপ কি ভাল কাপড় না হ'লেও চিন্‌তে বিলম্ব হয় মুখুযো মশায়?—আমাদের ভাগ্যি ভাল তাই এমন মেয়ের সন্ধান পেয়েছি।

উত্তরা গৃহকোণে বসিয়া লজ্জায় সারা হইতেছিল। রঘুনন্দন কহিলেন—ছেলেটিকে সঙ্গে আন্‌লেন না কেন?···

নিরঞ্জন ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—এনেছি বইকি।—নিরঞ্জন সরকার বাজে কথা কয় না মুখুয্যে মশায়—বুঝ্‌লেন? বলিয়াই পার্শ্বোপবিষ্ট যুবককে কহিলেন—তোর শ্বশুর মশায়কে প্রণাম কর টিপু!

টিপু নামক যুবকটি রঘুনন্দনের পদধূলি লইয়া আবার পূর্ব্বস্থানে আসিয়া বসিলে,—রঘুনন্দন বার কতক ঘন ঘন তাহার মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন।

রঘুনন্দনের বুকখানা যেন কোন্ অনির্দ্দিষ্ট জল্লাদের নির্ম্মম লৌহযন্ত্রে ভাঙিয়া চূরমার হইয়া গেল!…হায় অদৃষ্ট! সোণার প্রতিমা! উত্তরার ভাবী স্বামী এই কদাকার যুবা!…যাহার মুখাকৃতি দেখিলে বিশ্ব-বিধাতাকেই অভিশাপ দিতে ইচ্ছা হয় —শুধুই কি দেখিতে কদাকার! টিপুর একটি চোখ নাই! সম্মুখের একটী দাঁত অসম্ভব রকম বড় হইয়া —ঠোঁটের উপর নামিয়া পড়িয়াছে!…মানুষের রঙ্ যে এতো কালো হয়, ইহার পূর্ব্বে রঘুনন্দন আর কখনো দেখেন নাই।

নিরঞ্জন কহিলেন—মা জননি!—একবারটি বাইরে এসো তো মা!

উত্তরা কিন্তু মোটেই গৃহ হইতে বাহিরে আসিল না। রঘুনন্দনও কন্যাকে বাহিরে আসার জন্য ডাকিলেন না।

নিরঞ্জন ব্যস্তভাবে কহিলেন—আফিসে আজ আবার নাইট-ডিউটী আছে। বেশীক্ষণ তো অপেক্ষা করতে পারবো না। মেয়েকে আস্তে বলুন মুখুয্যে মশায়!

রঘুনন্দন চিন্তিত হইয়াছিলেন। হঠাৎ চমক ভাঙিতেই কহিলেন—এত তাড়াতাড়ি!…তা বেশ তো…ওরে উত্তরা!—একবারটি বেরিয়ে আয়।

উত্তরা তবুও নীরবে বসিয়া রহিল।

নিরঞ্জন বাবু মোটেই বিস্মিত হইলেন না। রঘুনন্দন ও উত্তরার এই ঔদাসীন্যটুকু তাঁহার অন্তর স্পর্শ করিয়াছিল। কেন না, এই ভ্রাতুষ্পুত্রটীর জন্য যত জায়গা হইতে সম্বন্ধ আসিয়াছে—একজনও পাত্র চাক্ষুষ করিয়া পাকাপাকি কথা কহিতে সম্মত হয় নাই।

ক্ষুদ্র বাড়ীখানির মধ্যে অনেকগুলি লোক জমা হইলেও, সেখানে পূর্ণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছিল।—কাহার মুখে কথা নাই! যে যার চিন্তায় বিভোর!—

—এম্‌নি সময় এই মুক বাড়ীকে মুখর করিয়া যে ব্যক্তি সহসা প্রবেশ করিলেন—তিনি বেলেঘাটারই একজন ধনী ব্যবসায়ী,—গোবিন্দবাবু।

রঘুনন্দন সম্বর্দ্ধনা করিয়া তাঁহাকেও বসিতে বলিলেন বটে, কিন্তু বাটীতে বসিবার আসনও ছিল না এবং গোবিন্দ বাবু বসিবার জন্যও আগ্রহ দেখাইলেন না। কহিলেন—বসবার সময় সেই মুখুয্যে মশায়! আপনার কাছে আজ আমি মার্জ্জনা চাইতে এসেছি।

রঘুনন্দন বিস্মিত হইয়া চাহিতেই গোবিন্দ বাবু বলিলেন—দিনকতক আগে, আমার বৈঠকখানায় আপনার ও আপনার মেয়ের সম্বন্ধে গল্প করেছিলাম। আজ হঠাৎ শুন্‌লাম এক ব্যাটা ট্যাক্সি-ড্রাইভার, আমারই নাম করে আপনাদের বাড়ী এসেছিল। সাবধান করে দিচ্ছি মুখুয্যে মশায়! কদাচ সেখানে বিবাহ-সম্বন্ধ করবেন না!···আমি শুনেই ছুটে আস্‌চি। বাড়ী খুঁজে নিতেও অনেকখানি বেগ পেতে হ'য়েছে।

রঘুনন্দন জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি তাঁদের আসার কথা কোত্থেকে শুন্‌লেন?

—সেই ব্যাটারাই গিয়ে লম্ফ ঝম্ফ করছিল। বলে—গোবিন্দ বাবু! আপনার মুখে শুনে গেছলাম,—বিনা পণেই বিয়ে করতাম, কিন্তু মেয়ে-টার বাপের যা অহঙ্কার! আমাদের সঙ্গে কথাই কইলে না। বলে—দিন কতক পরে আস্‌বেন।

বিনীতভাবে রঘুনন্দন কহিলেন···তার জন্যে আপনি কেন কষ্ট ক'রে এতখানি পথ—

না—না, এযে আমার কর্ত্তব্য। তারপর আমার নাম ক'রে এসেছিল যে!—বিশেষতঃ আমি যখন তাদের মাতাল দুশ্চরিত্র বলে জানি,...আপনাকে না জানালে ব্রাহ্মণ-কন্যার চোখের জলে যে সর্ব্বনাশ হ'য়ে যেত আমার।...আপনাকে আরো অনুরোধ করে যাচ্ছি—দিন কতক পরে আবার যদি আসে, তাদের বলে দেবেন—মেয়ের বিয়ে দোব না...সুপাত্র দেখে দিলে মেয়ে গাছতলায় বাস করেও সুখে থাকে মুখুয্যে মশায়!—কুপাত্রে কন্যা দান করলে নরকবাস হয়।...

নিরঞ্জন বাবু বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিলেন। তাঁহার সঙ্গের লোকেরা পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করিতে লাগিল।

গোবিন্দ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—এঁরা সব কোত্থেকে এসেচেন মুখুয্যে মশায়? চিন্‌তে পারলাম না তো।

রঘুনন্দন অলক্ষ্যে দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—এঁরাও পাত্রী দেখতে এসেচেন। বলিয়াই ইচ্ছাপূর্ব্বক টিপুকে দেখাইয়া দিলেন—ইনিই পাত্র।...

গোবিন্দ বাবু বিস্মিত এবং বিরক্ত হইয়াই সাম্‌লাইয়া লইলেন। বলিলেন—দুর্ভাগ্য আমরা যে ব্রাহ্মণ নই। নইলে আজ থেকে পুত্রবধূ করে ঘরে তুল্‌তাম্।...কি ব'লবো মুখয্যে মশায়! দেশের এত বড় বিড়ম্বনা আর কিছুতেই নেই।...যে দেশে রূপ-গুণের আদর নেই—সে দেশ কি একটা দেশ?...অথচ এই দেশের কবিরাই 'আমার দেশ' গান গেয়েছিলেন।...কিন্তু দোহাই মুখুয্যে মশায়! মেয়েটাকে হাত-পা বেঁধে জলে ডুবিয়ে মারবেন না। না জোটে, থাক্‌না—আইবুড়ো হ'য়ে। কি ক্ষতি?...চেয়ে দেখুন দেখি একবার—আপনার অমন মেয়ের কি এই—'বর'?—হওয়া উচিত?

কষ্টে অশ্রু দমন করিয়া রঘুনন্দন কহিলেন—কিন্তু আইবুড়ো রেখেই বা করবো কি গোবিন্দবাবু?···মানুষ তো অমরত্ব লাভ করে পৃথিবীতে আসেনি। আমার এই স্থবির দেহটার পতন অবশ্যই একদিন হবে, এবং সম্ভবতঃ তার দেরীও নেই; আমার মৃত্যুর পর হতভাগী দোরে দোরে ভিক্ষে করে বেড়াবে, তা দেখে আমি যে স্বর্গে গিয়েও শান্তি পাবো না।...আমার যে উপায় ব'ল্‌তে কিচ্ছু নেই।

গোবিন্দবাবু বলিলেন—বেঁচে থেকেই কি ওকে আপনি খাওয়াতে পারবেন?

—কেমন করে পারবো? শত জন্মের পাতক যে আমাকে এই একজন্মেই ভোগ করতে হচ্ছে। ওকে খাওয়াবো আমি?—আমাকেই যে চব্বিশঘণ্টা মেয়ের মুখ চেয়ে ওঠা-বসা করতে হয় গোবিন্দবাবু!—আমি যে সকল রকমে কাঙাল!

গোবিন্দবাবু সহসা হাতযোড় করিয়া মিনতির সুরে বলিলেন—আজ সকল ভার এই অধমের ঘাড়েই চাপিয়ে দিন মুখুয্যে মশায়।—গোবিন্দের সে শক্তি আপনাদের আশীর্ব্বাদে যথেষ্ট আছে।...যতদিন না সুপাত্র পাওয়া যায়, ততদিন মা-উত্তরা আইবুড়ো থাক্।...কুপাত্রে কন্যাদান—সে তো আপনার নরকের পথ প্রশস্ত করে রাখা।...তারপর নিরঞ্জন প্রভৃতি সমাগত ভদ্রলোকদের বিনীতভাবে বলিলেন—আপরাধ—ত্রুটী—যত কিছু হ'য়েচে, দয়া করে আপনারা আজ মার্জ্জনা ক'রে যাবেন। দুনিয়ায় মুখুয্যে মশায়ের মত দুর্ভাগ্য বুঝি কারুর হয় না। ওঁকে আর অপরাধী করবেন না।

নিরঞ্জন অতি মাত্রায় অপ্রতিভ হইয়া আসন হইতে উঠিলেন, তারপর টিপুকে বলিলেন—উঠে আয়। কিন্তু মুখুয্যে মশায়? এর পরে

কিন্তু পস্তাতে হবে। যাকে একদিন অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন, চোখের জলে পা ধুইয়ে দিলেও আর সে ফিরে আস্‌বে না—এইটুকু স্মরণ রাখবেন।…তা'হলে উঠলাম মশায় গোবিন্দবাবু!…আপনার সৌজন্যে মুগ্ধ হ'য়েই চ'ল্‌লাম আজ।

গোবিন্দবাবুও এই বিকট পরিহাস হজম করিতে পারিলেন না। করযোড়ে বলিলেন—আজ্ঞে সে আমার পরম সৌভাগ্য ছাড়া অন্য কিছু নয়!

নিরঞ্জনবাবু আর বাক্যব্যয় করিলেন না। ধীরে ধীরে সঙ্গীদের লইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

বাড়ীতে তখন গোবিন্দবাবু ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি অন্য কেহ উপস্থিত নাই।

রঘুনন্দন ডাকিলেন—উত্তরা!

উত্তরা মাথা হেঁট করিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

রঘুনন্দন কহিলেন—ইনি তোর কাকাবাবু!

উত্তরা কপালে হাত ঠেকাইয়া গোবিন্দবাবুকে নমস্কার করিল।

রঘুনন্দন কহিলেন—উনি যা বলিলেন—সব শুনেছিস্ তো? আজ থেকে আমাদের সকল ভার উনি মাথায় করে বইবেন।

উত্তরা মাথা নীচু করিয়া পূর্ব্ববৎ দাঁড়াইয়া রহিল, মুখ দিয়া ছোট খাটো একটা কথাও বাহির করিল না।

গোবিন্দবাবু পকেট হইতে একখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া উত্তরার সামনে ধরিতেই, উত্তরা দুই পা পিছাইয়া গেল। মুখে তাহার বিকট [illegible] সঙ্কোচের ছাপ!

গোবিন্দবাবু হাসিয়া কহিলেন—পাগলী মায়ের আমার বেজায়-লজ্জা

যে মুখুয্যে মশায়!…নে মা!…এ যে তোর কাকাবাবুর টাকা, তোরও এতে ষোল আনা অধিকার র’য়েচে।

উত্তরা ধীরস্বরে বলিল—আমি তা জানি কাকাবাবু! কিন্তু উপস্থিত আমাদের খরচ করবার মত দু’এক টাকা সম্বল আছে। দরকার হ’লে, আপনার কাছে একদিনও চেয়ে নিতে লজ্জা করবো না। আজকের মত ওটা আপনি রেখে দিন।

গোবিন্দবাবু বলিলেন—কিন্তু দু’এক টাকাতেই কি দু’দশ দিন চল্‌বে মা? আবার আমি কবে আসবো না আসবো তার তো কিছু ঠিক ঠিকানা নেই।…

উত্তরা তথাপি টাকা হাতে করিল না। বলিল—অভাবের হাতে এক সঙ্গে বেশী টাকা থাকা উচিত নয় কাকাবাবু! তাতে খরচ বেশী হয়।… দু’দিন পরেই কি আপনি আমাদের ভুলে যাবেন?…তা, যদি যান, তাহ’লে দরকার কি তুচ্ছ টাকাতে?…টাকার মতই আমরা আত্মীয়-কাঙ্গালী। হয়তো বা টাকার অভাব চেয়েও আত্মীয়-বন্ধুর অভাবটা আমাদের ঢের বেশী।

রঘুনন্দন যেন বিরক্ত হইতেছিলেন। কহিলেন—না নিলে উনি কষ্ট পাবেন উত্তরা!…

উত্তরা বলিয়া উঠিল—একটুও কষ্ট পাবেন না বাবা!…আমার যিনি কাকাবাবু হলেন—তাঁকে কি আমি পর ভাব্‌বারই স্পর্দ্ধা রাখ্‌চি বাবা? …উনি যে আমারই কাকাবাবু!

গোবিন্দবাবু জামার হাতায় চোখ মুছিয়া ধীরে ধীরে নোটখানা পকেটে রাখিলেন, তারপর সহসা উত্তরার মাথায় হাত রাখি[illegible]ন—ব্রাহ্মণ না হলেও আজ আমি তোর কাকাবাবু!—সেই জোরে আশীর্ব্বাদ

করছি মা!—তুই জীবনের কোন দিনই যেন অন্তরের দুর্ব্বলতার কাছে পরাজয় স্বীকার করিস্‌নি।—কিন্তু আজ আমায় কথা দিয়ে রাখ্‌ উত্তরা! বল্‌ মা!—অভাবের সময় এই বুড়ো ছেলেটার কথাই তোর আগে মনে পড়বে?

উত্তরা অভিভূত হইয়া বলিল—আমি নেমকৃহারামী কর্‌তে জানি না কাকাবাবু! শুধু আজ এই কথাটাই শুনে রাখুন।

গোবিন্দ হৃষ্ট মনেই বাটী হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

রঘুনন্দন কহিলেন—তোর আজ হ'য়েচে কি উত্তরা? হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেল্‌লি যে?

উত্তরা কহিল—এটাকে কিন্তু লক্ষ্মী বলে না বাবা! আসল অলক্ষ্মী ব'লতে যদি কিছু থাকে তো এই-ই। চাতুরীর সঙ্গে সদ্ভাব রেখে তো ভদ্রতা রক্ষা হয় না বাবা! তাতে মনের পাপ মনে মনেই ভীষণ হ'য়ে দাঁড়ায়। টাকা থাক্‌তেও ভিক্ষে করা—ভিখারীদের মহাপাতক।

—কিন্তু সে টাকায় তোর কতদিন চ'ল্‌বে?

—যদি আধঘণ্টা চলে—তা হ'লেও এই আধঘণ্টা পূর্ব্বে আমি সাহায্যের জন্য কারুর কাছে হাত পাতবো না; কলিতে ভিক্ষার মত নিকৃষ্ট পন্থা আর কিছু নেই বাবা! ঘরে সামান্য একটা জিনিষও যতক্ষণ বেচ্‌বার মত আমাদের থাক্‌বে, ততক্ষণ কারুর কাছেই হাত পাত্‌তে ব'লো না আমাকে। আমি তা পারবো না।

—কিন্তু যখন তা-ও আর থাক্‌বে না উত্তরা?—তখন? কি করবি?

উত্তরা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া কহিল—যাদের কেউ থাকে না,—

ভগবান কি তাদের ভুলে থাক্‌তে পারেন বাবা? সৃষ্টিকর্ত্তা আর পালন-কর্ত্তা—যে তিনিই।

রঘুনন্দন অপর দিকে মুখ ফিরাইয়া চিন্তান্বিত হইলেন। কন্যার কথায় তাঁর রাগ হইল কি দুঃখ বা অভিমান হইল—তাহার ভাব দেখিয়া বোঝা গেল না।

ব্রতী সঙ্ঘ গ্রন্থাগার
(স্থাপিত ১৩৫১ সাল)
ঘোষপাড়া, বালী।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইহারই দিন দশ পরে একদিন সকাল বেলায় রঘুনন্দন উত্তরাকে বলিলেন—একটা রিক্সা ডেকে আন্‌তো মা।...একবারটি বাইরে যাবো।

উত্তরা জিজ্ঞাসু হইয়া চাহিতেই রঘুনন্দন কহিলেন—আর একটা কাগজের আফিস ঘুরে আসি।...সেবারে বিজ্ঞাপন দেওয়া তো হ'য়ে ওঠেনি কিনা।...ওঁরা সব এসে পড়লেন, কাজেই—

উত্তরা মাথা হেঁট করিয়া বলিল—ও-সবে আর কাজ নেই বাবা!

রঘুনন্দন কহিলেন—কাজ নেই ব'ল্‌লে কি চলে মা?...সব চেয়ে এখন এইটাই আমার বড় কাজ।...কবে আছি কবে নাই, তোর একটা বিয়ে করে যদি যেতে পারি উত্তরা।

উত্তরা বলিয়া উঠিল—আমি তো অনেকদিন তোমায় ব'লে রেখেছি বাবা!—যার কেউ নাই, তার ভগবান আছেন। মিছি মিছি—সাত দোরে ঘুরে, সাতজনকার অপমান সইতে আমি তোমায় দেব না।

রঘুনন্দন হাসিয়া কহিলেন—সবাই কি আর অপমান করে মা?... সংসারে মানুষ আছে বলেই তো অমানুষ কথাটার সৃষ্টি হ'য়েচে। মন্দ আছে বলেই লোকে ভালর গুণটুকু ধরতে পারে উত্তরা! নইলে পারতো না।...কিন্তু আর দেরী করিসনি—যা একখানা রিক্সা ডেকে আন্।

উত্তরা স্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ বসিয়া বসিয়া কি চিন্তা করিল, তারপর বাক্সের মধ্য হইতে একখানা পুরাতন সাড়ী বাহির করিয়া আঁচলে ঢাকিতে ঢাকিতে বলিল—একটুখানি সবুর করো বাবা!—আমি আস্‌চি।

রঘুনন্দন জিজ্ঞাসা করিলেন—তার চেয়ে গোবিন্দ বাবুকে যদি এক-খানা চিঠি লিখে দিস—

কথার মাঝখানেই উত্তরা বলিয়া উঠিল—এখনো সে দুঃসময় আমাদের আসেনি বাবা।...তুমি ভাবছো কেন? বলিয়া আর এক মিনিটও অপেক্ষা করিল না।

রঘুনন্দন বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন—এই অযথা আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া লাভ কি?...

...প্রায় আধঘণ্টা পরে, উত্তরা ফিরিয়া আসিল। হাতে তার চাল-ডাল-নুন প্রভৃতি যাবতীয় সামগ্রী।

রঘুনন্দন জিজ্ঞাসা করিলেন—কত পেলি? দু'টাকা না তিন টাকা? কাপড়খানা কিন্তু আট টাকায় খরিদ করা হ'য়েছিল।

উত্তরা হাতের জিনিসপত্র নামাইয়া রাখিতে রাখিতে জবাব দিল—তবে আর কি পেয়েছি না পেয়েছি সে কথা জান্‌তে চেয়ো না বাবা!

রঘুনন্দন কহিলেন—কোনো জিনিসই তো আমরা ধরে রাখতে পারবো না মা!—এক এক করে গেছে, যাবেও।

উত্তরা বলিল—বারো আনার এক পয়সা বেশী দিলে না বাবা! নবু বেনের দোকান থেকেই সব শেষ করে এলাম। কিন্তু রিক্সার ভাড়া তো এই থেকে কুলোবে না। আজ বরং তুমি বেরিয়ো না। কাল যা হয় হবে।

রঘুনন্দন কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন...এম্‌নি সময় বাহিরে দাঁড়াইয়া নিরঞ্জন বাবু হাঁকিলেন—মুখুয্যে মশায় বাড়ী আছেন?

উত্তরা তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিল।

রঘুনন্দন কহিলেন—কে? নিরঞ্জন বাবু?

—আজ্ঞে,...

—কোনো দরকার আছে ?...যা তো মা উত্তরা ! দরজাটা খুলে দিয়ে আয় তো।

কিন্তু উত্তরা কিছুতেই ঘর হইতে বাহিরে আসিল না।

রঘুনন্দন পুনঃ পুনঃ ডাকাডাকি করায় সে ঘরে থাকিয়াই বলিল—দরজা তো বন্ধ করা নেই।...আসতে বলো না।

নিরঞ্জন ভিতরে আসিয়া রঘুনন্দনের পাশেই বসিয়া পড়িলেন।

রঘুনন্দন কহিলেন—আজ আবার হঠাৎ এদিকে যে ?

নিরঞ্জন কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়া পকেট হইতে একখানা সংবাদপত্র বাহির করিলেন, তারপর ভাঁজ খুলিতে খুলিতে বলিলেন—সেদিনকার বিজ্ঞাপনের দরুণ আপনার কাছে যৎকিঞ্চিৎ পাওনা আছে। তাই ম্যানেজার বাবুর হুকুম মত তাগাদায় এলাম।...

টাকা দিবার আশঙ্কা বা চিন্তা রঘুনন্দনের অন্তরে যতখানি আসিল, তার দ্বিগুণ কি চতুর্গুণ আসিল—আনন্দ !—সফলতার আনন্দ !...তবে বিজ্ঞাপন ছাপা হইয়া দেশ-বিদেশে প্রেরিত হইয়াছে ! শত শত লোক তাঁর এই দুর্দ্দশার ইতিহাস পাঠ করিয়াছে !—কিন্তু ফল তো কই আজো ফলিল না !

উত্তরার মুখখানা কপাটের পাশ দিয়া দেখা যাইতেছিল। সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই নিরঞ্জন কহিলেন—ভালোর তো কাল নয় এখন !...পাত্র ঠিক করে আন্‌লাম, আপনি অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন অথচ ওর চেয়ে কদর্য্য পাত্র ভুলেও কোনদিন আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে আসবে না।...সে দিন কি আর আছে মুখুয্যে মশায় ? না ছিল কোন দিন ?... এখন টাকা উপার্জ্জনের যুগ, তা সে যে কোন দিক্‌ দিয়েই হোক্‌ না কেন।

রঘুনন্দন মাথা হেঁট করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—কিন্তু কি করবো বলুন? গোবিন্দ বাবু আমার চিরকাল হিত তাকিয়ে আসছেন, তাঁর অমতে কোন কাজ করা কি আমার উচিত হবে? বিশেষতঃ আমার এই অকর্ম্মণ্য দেহ নিয়ে—

কথার মাঝখানেই নিরঞ্জন বাবু বলিয়া উঠিলেন—তিনি ব'লে কয়ে গাছে ওঠাচ্ছেন মশায়! শেষকালে মইটাও আবার তিনিই কেড়ে নেবেন।···পাত্র দেখতে খারাপ হলে কি হবে? মেয়ে যে আমরণ কাল দুধে ভাতে খেতে পারতো।...এখনো বুঝে দেখুন।

রঘুনন্দন কহিলেন—বুঝেচি আজ দুচার দিন ধরে অনবরত। কিন্তু মন কিছুতেই সায় দেয় না। অদৃষ্ট ছাড়া তো পথ নেই নিরঞ্জন বাবু! যা আছে বরাতে তাই হবে। মন যদি সায় দিতে না চায় নিরঞ্জন বাবু! ধন নিয়ে কি হবে? দেওয়ারও সার্থকতা যতখানি, নেওয়ার সার্থকতাও ততখানিই। মেয়ে আমার খুসী হবে না মশায়! রক্ত মাংসের শরীর নিয়ে, পূর্ণ জ্ঞানের সঙ্গে, সে কখনই তার ভবিষ্যৎ সঙ্গীকে অকেজো ভেবে বরণ করতে পারবে না।

—কেন আপনার মেয়ে কি অপছন্দের কথা জানিয়েছে?

—মুখে হয়তো জানাতে লজ্জা বোধ করেছে? কিন্তু সে তো আমারই মেয়ে। আমি বাপ হ'য়ে যেটা তারই জন্য পছন্দ করতে পারবো না—সে তা কেমন করে করবে?

রুষ্ট হইলেও বাহিরে সে ভাব প্রকাশ না করিয়া নিরঞ্জন বাবু কহিলেন—ভাল কথা।···তাহলে টাকাটা কি আজই দেবেন?...আজ না দিলেই চলবে না কিন্তু।...রোজ রোজ এতখানি পথ আসা যাওয়া করা আমাদের পক্ষে তো সম্ভবপর নয়।···কাজের মানুষ আমরা।...

তাহলে চার টাকা আট আনা আমাকে দিয়ে দিন।...আমিও আপনার মেয়ের সুখ সৌভাগ্যের আশীর্ব্বাদ করতে করতে স্বস্থানে ফিরে যাই।

রঘুনন্দন চিন্তান্বিত হইলেন।

নিরঞ্জন কহিলেন—এম্‌নি বদ্ জায়গা, আসা-যাওয়ার ভয়ানক অসুবিধে।...দশ টাকা দিয়ে ট্রামের টিকিটখানা কিনে রেখেছি অথচ এখানে আস্‌তে কোন কাজেই তা লাগলো না।...কিন্তু আর দেরী করবেন না মশায়!...আমাকে উঠ্‌তে হবে। আফিসের কাজ আছে।

রঘুনন্দন ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিলেন—মানুষের দেহের তাজা রক্ত যদি বাজারে বিক্রি করার প্রথা থাক্‌তো, তাহলে আপনার টাকা পেতে বিলম্ব হ'ত না নিরঞ্জন বাবু! আপনি বিশ্বাস করবেন কি না জানিনা, এইমাত্র মেয়েটা আট টাকা দামের একখানা সাড়ী বেচে মাত্র বারো আনা পয়সা পেয়েছে। তারও একটা আধ্‌লা আর ঘরে নেই। চাল-ডাল নুন তেল কিন্‌তে—

নিরঞ্জন কহিলেন—ওসব দুঃখের কাহিনী শুনবে তারা যারা কাঙালী বিদায় করার ব্রত পালন কর'ছে। কিন্তু আমরা করি ব্যবসা!...আমাদের কাছে এমনি ধারা রোদন—সে অরণ্যে রোদন ছাড়া অন্য কিছু নয়।...আপনি শীগ্‌গীর টাকাটার ব্যবস্থা করে ফেলুন।

একটা প্রচণ্ড দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া রঘুনন্দন কহিলেন—আমাকে সকল রকমেই মার্জ্জনা করুন! আমি অপারগ। আজ আমার কোন রকমেই টাকা দেওয়ার সঙ্গতি নাই।

—তা হলে সঙ্গতিটা হবে কবে? দয়া করে জানিয়ে দিন।

—গোবিন্দ বাবুকে আজই খবর পাঠাচ্ছি। অবশ্যই সংবাদ পেলে

টাকা তিনি না দিয়ে থাক্‌তে পারবেন না···আপনি বরং হপ্তা খানেক পরে আসবেন।

নিরঞ্জন বাবু উঠিতে গিয়াই হঠাৎ সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন—বাঁ-দিকের কপাটে দেহভার এলাইয়া দিয়া আলুলায়িত-কুন্তলা উত্তরা স্থির-দৃষ্টে তাঁহারই পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে!

নিরঞ্জন বাবু পুনরায় আসনে বসিয়া অভিভূতের মত চাহিলেন।··· আহা! এমন মেয়ের বিবাহ হয় না···আমাদের এই বাঙলা দেশের কি আর গতি মুক্তি আছে! ..এমন প্রতিমার মত চেহারা।

উত্তরা যেন সলজ্জ হইয়া মাথা হেঁট করিল—কিন্তু কি জানি কেন—সে স্থান হইতে এক পাও নড়িল না।

নিরঞ্জন বাবু চাহিতে চাহিতে বলিলেন—আচ্ছা রঘুনন্দন বাবু!

—আজ্ঞে করুন।

—আপনাকে একটা কথা ব'ল্‌বো?

—বলুন না।

—আপনি কিন্তু একটুও অবিশ্বাস করবেন না···তাছাড়া আমাকে বিশিষ্ট আত্মীয় বা শুভার্থী বলেই মনে করবেন।

—সে তো সাক্ষাতের প্রথমদিন থেকেই মনে করে এসেছি এবং আজও তা করছি।···কিন্তু কি বলছিলেন আপনি?

নিরঞ্জন বাবু আর একবার উত্তরার পানে চাহিয়া লইয়া ধীরে ধীরে কহিলেন—আমার ভাইপোটা যে অত্যন্ত কদর্য্য চেহারার, তা আমি দু'লক্ষবার স্বীকার করি, এই সোনার প্রতিমা উত্তরার বিবাহ, কানা টিপু সুলতানের সঙ্গে হোক,—এ বাঞ্ছা আর আমার মনে একটুও নেই।···কিন্তু যদি ধনে-মানে-বিদ্যায়—সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ পাত্র এই

উত্তরার জন্যে আমি যোগাড় করে দিই,—তার সঙ্গে বিয়ে দেবেন তো ?

উত্তরার ভ্রূ কুঞ্চিত হইল। কিন্তু রঘুনন্দন আনন্দে ফাটিয়া পড়িবার মত হইলেন।...আহা! দীন-ভিখারী অকর্ম্মণ্য ব্রাহ্মণের কপালে এত সুখও লেখা ছিল! কহিলেন—আজ্ঞে করুন! আপনি আমায় যা ব'লবেন—আমি নির্ব্বিকারে তাই মেনে চ'লবো। কেবল সেই পাত্রটীর সম্বন্ধে একটা কথাও দয়া করে ব'লবেন না নিরঞ্জন বাবু।...ও সঙ্কল্পটা আমরা পিতা পুত্রীতেই পরিত্যাগ করেছি।...কিন্তু যে ছেলেটীর কথা ব'লছেন—সেও কি আপনার হাতে আছে ?···আত্মীয় ?

—হাঁ হাতে আছে বই কি। আফিসের চাকরী, মাসে দু'শো টাকা বেতন। তা ছাড়া দশ পাঁচ টাকা উপরি পাওনাও আছে।···সমাজে যথেষ্ট মান খাতির—এমন পাত্র আপনার পছন্দ ?

উৎসাহিত হইয়া রঘুনন্দন বলিয়া উঠিলেন—একশোবার পছন্দ নিরঞ্জন বাবু! এ যদি পছন্দ না হয়, তাহ'লে বিয়েই দেব না। কিন্তু পাত্রপক্ষ যদি দু'দশ হাজার হেঁকে বসে ?···আমার অবস্থার কথা তো আপনার অজানা নয়। একটা তামার পয়সাও আমার সম্বল নেই।

নিরঞ্জন বাবু কহিলেন—আপনি কেন দেবেন ? কিছু দিতে হবে না। পাঁচটী হরীতকী দিয়ে কন্যা সম্প্রদান করিবেন। আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি। যদি বিশ্বাস না হয়, অনুমতি করুন আমি এই দণ্ডেই কন্যা আশীর্ব্বাদ করি।

—আপনার কি জানেন নিরঞ্জন বাবু! অবিরত আঘাত সহ্য ক'রে ক'রে আমার সর্ব্বাঙ্গই অসাড় হ'য়ে রয়েচে। কাজেই বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা আমার একটুও নাই। তবে ভরসা পেলে বুকে সাহস রাখ্‌তে পারি এইটুকু মাত্র।···

—তা হ'লে আশীর্ব্বাদ করে যাচ্ছি। পঞ্জিকার সব আগে যে দিন, সেই দিনেই বিবাহ স্থির জানবেন। কি বলেন—রাজী?

—আমি তো সর্ব্বান্তঃকরণে রাজী। কিন্তু আশীর্ব্বাদ করবেন—আপনি, সুতরাং সেটা আপনারই দয়ার উপর নির্ভর করছে।

নিরঞ্জন বাবু উত্তরার পানে চাহিয়া বলিলেন—চারটি খানি ধানদূর্ব্বা নিয়ে এসো তো।...তোমাকে আশীর্ব্বাদ করে যাই।

উত্তরার মাথাটা অসম্ভব রকমে নমিত হইয়া পড়িল। সে না পারিল ভিতরে যাইতে, না পারিল আগাইয়া আসিতে।

রঘুনন্দন কহিলেন—লজ্জা কি মা! উনি যা চাইলেন এনে দাও।... তারপর নিরঞ্জনকে বলিলেন—দুর্ভাগ্য আমার চেয়ে মেয়েটার লক্ষ গুণে বেশী,...নইলে আশীর্ব্বাদ করবার উপকরণ, তাও আজ ওকেই খুঁজে আনতে হচ্ছে।

হাসিয়া নিরঞ্জন কহিলেন—সূক্ষ্ম বিচার করতে গেলে—এইটাই শাস্ত্রসম্মত মুখুয্যে মশায়! আশীর্ব্বাদ আপনি নেবেন না, নেবে ও নিজেই ...কিন্তু উত্তরা! আর দেরী ক'রো না। আমার মাথায় দু'শো রকমের কাজ চাপানো রয়েচে। বেশীক্ষণ তো বস্‌তে পার্‌বো না।... শীগ্‌গীর যাও।

উত্তরা অতি ধীরকণ্ঠে কহিল—ঘরে তো ধান নেই, দোকান থেকে আন্‌তে হবে।

নিরঞ্জন বুক-পকেট হইতে ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন, তারপর ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—কথা দেওয়ার মানে জাত দেওয়া। যখন ব'লে ফেলেচি, তখন কোন রকমেই আর পিছিয়ে যাবো না।...আচ্ছা, আমিই সব যোগাড় করে আন্‌চি।...বলিয়া তাড়াতাড়ি বাটী হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

শুভদৃষ্টি—

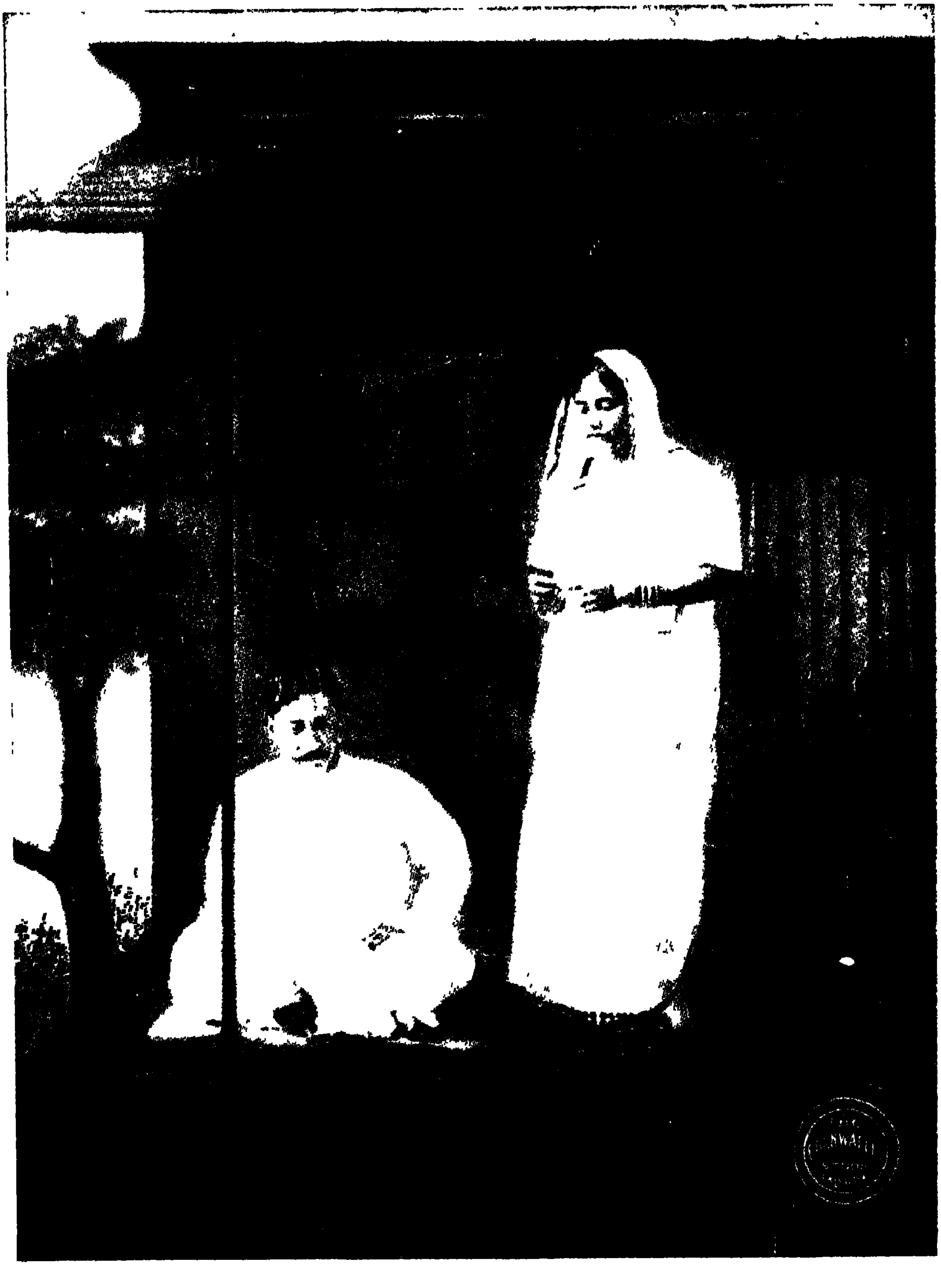

(নিরঞ্জনবাবু ও উত্তরা)

উত্তরা অন্তরের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করিতে পারিবে না।

রঘুনন্দন কন্যার পানে চাহিয়া হৃষ্টমনে বলিলেন—তোর কথাই সত্যি মা! যার কেউ নেই তার ভগবান আছেন।...কে জান্‌তো—এমন সম্বন্ধ কপালে জুটবে! নিরঞ্জন বাবুর মত ভদ্রলোক আমি তো জীবনে একটাও দেখিনি।

তীব্র হতাশার সুরে উত্তরা বলিল—কিন্তু যত বড় ভদ্রলোকই ওঁকে বল না কেন—আর উনি ফিরে আস্‌বেন না.বাবা!

—"সে কি রে? তাও কি কখনো হয়?" বলিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে রঘুনন্দন উত্তরার পানে চাহিয়া রহিলেন।

উত্তরা কহিল—জগতে যারা বেশী কথা বলে তারা কাজ করে অত্যন্ত কম। উনি কি ভয়ঙ্কর বাচাল। আমার বিশ্বাস হয় না।

রঘুনন্দন স্মিতমুখে কহিলেন—পাগ্‌লী কোথাকার! কম কথা বলা আর বেশী কথা বলা—এই দুই শ্রেণীর লোক তুই কতগুলো চোখে দেখেছিস্?

উত্তরা স্পর্দ্ধার সহিত কহিল—কিন্তু বইগুলোর লেখা যদি একটাও না খাটে, তাহ'লে বই লোকে লেখে কেন? আর দুনিয়ার লোক পয়সা খরচ করে তা পড়েই বা কিসের জন্যে? আমি ঠিক বলছি বাবা! তিনি আর আসবেন না। তা ছাড়া এই প্রবঞ্চনা তো তোমার ভাগ্যে আজ নতুন নয় বাবা! আমার কল্যাণে দুনিয়ার লোকের কাছে অনেক কিছুই তোমার শিক্ষা হ'য়ে গেল!...তা ছাড়া উনি ফিরে এলেও, কোথায় কি করছেন—কোথায় সব ঘর-বাড়ী তা' তো জানা শোনা...

উত্তরার মুখখানা লজ্জার আধিক্যে নমিত হইয়া পড়িল। ভাগ্যে তার এতও লেখা ছিল। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূজনীয়, জীবনের একমাত্র সম্বল—এই পিতার নিকটেই অন্তরের গূঢ় লজ্জাবরণ-ঘেরা পুঞ্জীভূত সন্দেহের

রাশি একটি একটি করিয়া এই পিতৃ-চরণে ঢালিয়া দেওয়াই কি তার ললাট-লিপি !...কিন্তু আর তো সে পারে না।...অতি সরল অতি সোজা তার পিতাকে কুটিলতার আবর্ত্তে টানিয়া আনিয়া, নিজের স্বার্থ সাধন করা···না না—ভাগ্য সে ভাগ্যই,—মানুষ সব পারে, পারে না ভাগ্য ফিরাইতে! আপন ভাগ্য ফিরাইবার ভার ভাগ্য-বিধাতাকে ছাড়িয়া দেওয়া ছাড়া তার যে গত্যন্তর নাই।

আজ এই সহস্র সাধ-কামনা-আশাপূর্ণ জীবন, জীবনাধিক প্রিয় ভবিষ্যৎ—সব সে ভাগ্য বিধাতার চরণেই অর্ঘ্য দিতেছে—হে বিরাট মহিমান্বিত বিধাতা! আমার সবটুকুই তুমি গ্রহণ কর! সব—সবই... আমার বলিতে আজ আর কিছুই রাখিবার নাই আমার,—রাখিতেও চাহি না আর।···তুমি ভক্তি নাও—ভালবাসা নাও—প্রেম, মায়া, স্নেহ, মমতা, দুঃখ-শোক, লাঞ্ছনা, সাধনা-আরাধনা—সব—যথাসর্ব্বস্বই গ্রহণ কর,—আমি নিঃস্ব হই,—কাঙাল—পথের ভিখারিণী হই!—

—চুপটি করে কি ভাবছিস্ মা? উত্তরা!

উত্তরা নীরবে অধোবদন হইল।

রঘুনন্দন কহিলেন—জানা শোনার আর দরকার নেই মা! জীবনের সাড়ে তিন ভাগ কি তার চেয়ে হয়তো বেশীই কেটে গেছে আমার, সংসারের অভিজ্ঞতা, জনসাধারণের চরিত্র—সম্পূর্ণ না বুঝতে পারলেও একেবারেই যে বুঝি না—একথা আমি ব'লবো না...আমার এই দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে আজ তোকে বলে রাখচি—মা!—নিরঞ্জন বাবুকে অবিশ্বাসী ভেবে মন খারাপ কোরো না। তাছাড়া পাথারের মধ্যে ভেসে চলেছি আমরা, তৃণখণ্ডই আমাদের সব চেয়ে বড় আশ্রয় মা!...হাতের কাছে আর একটাও তো আঁকড়ে ধরবার নেই!

উত্তরা তথাপি অধোবদনেই বসিয়া রহিল, একটা কথাও কহিল না।

রঘুনন্দন অন্তরে অন্তরে ক্ষুব্ধ হইলেন।—একটি মাত্র কন্যা, মাতৃহারা—সর্ব্ব আত্মীয় হারা,—আজ তাহাকেও সুখী করিবার সকল ক্ষমতা হইতে তিনি বঞ্চিত! কহিলেন—উত্তরা! মা আমার! একবার তোর এই অক্ষম বাপের মুখপানে চেয়ে দেখ্ মা! কত গভীর যাতনা—কতবড় অসহ্য ব্যথা সে দণ্ডে দণ্ডে ভোগ করছে! উপায় নেই মা!—জ্বালার বিরাম নেই! জীবনটা তো শান্তিহারা হয়েই কেটে গেল,—পরকালেও কি তা-ই কাটবে মা?

রঘুনন্দন সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

উত্তরা আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, দুহাতে পিতার দু'টি পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—আমাকে অপরাধী কোরো না বাবা আমার। তুমি ছাড়া আমি যে দুনিয়ার কারুকে জানি না। শান্ত হও বাবা! তোমার উত্তরা—তোমার কথার অবাধ্য হ'তে কি পারে কখনো? তুমি যা ব'লবে আমি তাই করবো বাবা!...তুমিই যে আমার সব।

রঘুনন্দন অশ্রু মুছিয়া কন্যার মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, ...কিন্তু নয়ন আবার অশ্রুসজল হইয়া উঠিল।

ইতিমধ্যে নিরঞ্জন বাবু পুনঃ প্রবেশ করিলেন। হাতে তাঁর ধানদুর্ব্বা, এবং পশ্চাতে একটী নাতিবৃহৎ ঝাঁকা লইয়া একজন মুটে।

ঝাকার দ্রব্যাদি স্বহস্তে নামাইয়া লইয়া, নিরঞ্জন মুটেকে বিদায় দিয়া উত্তরার পানে চাহিয়া বলিলেন—এসব গুলো তুলে রাখো উত্তরা!

রঘুনন্দন ও উত্তরার দৃষ্টি অনেকক্ষণ হইতেই একদিকে নিবদ্ধ ছিল রঘুনন্দন ব্যস্তভাবে কহিলেন—নে-নে সব তুলে নে উত্তরা...কিন্তু

এসব আপনার নিছক পাগ্‌লামি ছাড়া অন্য কিছু নয় নিরঞ্জন বাবু! এই এত সন্দেশ, রসগোল্লা, দই রাবড়ী—এসব কেন?…আবার ছোট ঝুড়িতে কি রয়েচে?…খোল্ তো মা দেখি…ওঃ এ কি মশায়… সিঙ্গাড়া, কচুরি, পান্‌তুয়া, গজা…এও এনেছেন?…ছি ছি! এ কি ছেলেখেলা বলুন তো?…ও সর্ব্বনাশ! আবার ফলটলও তো অনেক দেখতে পাচ্ছি!…নাঃ এই অক্ষমকে এত ঋণের বোঝা চাপিয়ে দিলে তার ঘাড় কি খাড়া থাকতে পারবে নিঞ্জন বাবু?

নিরঞ্জন কিন্তু সে কথায় একটুও কাণ না দিয়া উত্তরাকে কহিলেন—এই বড় বড় ঠোঙাতে ময়দা, সুজি, চিনি, ডাল, চাল এই সব আছে।

উত্তরা খুব আস্তে জিজ্ঞাসা করিল—এসব কেন আন্‌লেন আপনি?… আমাদের তো দরকার ছিল না।

নিরঞ্জন কহিলেন—ভর্ৎসনা পরে কোরো উত্তরা—।—শীগ্‌গীর দুটো বড় বাটি দাও দেখি—

উত্তরা কহিল—কেন?

—দরকার আছে, দাও না—

রঘুনন্দন কহিলেন—দে মা! দে! পাগলের মত যখন অত্যাচার আরম্ভ করেছেন, তখন সহ্য না করলে বিপদ্ আছে।

নিরঞ্জনের কণ্ঠে দাবীর সুর ধ্বনিত হইল। কহিলেন—আপনাকে অনেকবার মিনতি করে জানিয়েছি—আমায় আত্মীয় বলে মনে রাখবেন। যদি আত্মীয়ের কাছে অন্ততঃ এই ব্যাপারে মিনিটে মিনিটে কৈফিয়ৎ তলপ করেন, তাহ'লে আত্মীয়-বিচ্ছেদের ব্যথা সহ্য করা ভিন্ন আর অন্য উপায় মনে আসে না।…দাও উত্তরা, বাটি দুটো দাও।

উত্তরা বিনা বাক্যব্যয়ে ঘরে ঢুকিল এবং ছোট ছোট দুটি পিতলের

বাটি আনিয়া নিরঞ্জনের সম্মুখে রাখিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন—পাগল করবে আজ তুমি উত্তরা!—ব'ললাম বড় বড় বাটির কথা—

উত্তরা মুখ নীচু করিয়া অকুণ্ঠিত ভাবে কহিল—এর চেয়ে বড় বাটি আমাদের নেই।

নিরঞ্জন কহিলেন—আচ্ছা, তবে ওগুলো রেখে দাও।...বলিয়া রঘুনন্দনকে কহিলেন—আমার আসতে খুব বেশী দেরী হবে না।···কিন্তু আপনার কি তামাক খাওয়া অভ্যেস আছে, মুখুয্যে মশায়?

রঘুনন্দন দীর্ঘশ্বাস মোচনান্তে কহিলেন—এককালে ছিল বটে, কিন্তু অভাবে পড়ে ত্যাগ করেছি।

নিরঞ্জন আর দাঁড়াইলেন না; যাইবার সময় উত্তরাকে বলিলেন—উনুন ধরাও,···আমি আস্‌চি।

উত্তরা বিস্মিত হইয়া চাহিতেই তিনি হাসিয়া কহিলেন—আত্মীয় ব'লে যখন স্বীকার করেছো, তখন আজ দুপুর বেলার খাওয়াটা তোমাদের বাড়ীতেই সারবো ভেবেচি, যত্ন করা আত্মীয় ব'লতে আমার বিশেষ কেউ নেই কিনা! তাই বাঁধা খাওয়া খেয়ে মুখেরও সাড়া শব্দ হারিয়ে গেছে সেইজন্যে মুখটাকে একটু খানি···

উত্তরা আর দাঁড়াইল না, কিছুমাত্র কুণ্ঠার ভাবও মনে আনিতে চাহিল না। নারীর এইখানেই পরাজয়। অতি বড় শত্রুকেও সে এ দাবী হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না।

উত্তরা সামান্য ক্ষণ চিন্তার পর, বলিল—খাওয়ানোর সুখ থেকে আজ আপনিই আমাকে বঞ্চিত করলেন কিন্তু···

—"কেন? উত্তরা! একথা ব'ললে কেন?" বলিয়া—যাইতে যাইতে নিরঞ্জন ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

উত্তরার কুণ্ঠাটুকু ক্রমেই অন্তর হইতে হ্রাস পাইতেছিল। কহিল—'বিদুর তার ক্ষুদ্‌কণা দিয়েই নারায়ণের তৃপ্তি-সাধন করেছিলেন। নারায়ণের কাছে বর চেয়ে নিয়ে লুচি, মিঠাই, ক্ষীর, ছানা, মাখন খাওয়ানোর ইচ্ছা তাঁর কখনই হয় নি।...আপনি অতিথি, অন্তরের ভক্তির সঙ্গে সাধ্যমত আমার যা জুট্‌তো যদি তাই দিয়েই আপনার তৃপ্তি সাধন করতে পার্‌তাম, তাহলে সে আনন্দ আজ আমার বুকে ধর্‌তো না।

নিরঞ্জন হাসিয়া কহিলেন—তা বেশ তো উত্তরা! তুমি তাই দিয়েই তোমার অতিথি সৎকার করো। যা তোমার ঘরে আছে—

—আপনি যে অনেকগুলো টাকা পয়সা খরচ করে অনেক জিনিস কিনে আনলেন—এসব কি হবে?

—কেন রেখে দিয়ো, নষ্ট হওয়ার মত তো কিছু আনিনি।—আজ তোমার আপন জিনিষ দিয়েই আমাকে খাইয়ে দাও!

উত্তরা কিন্তু এতে সন্তুষ্ট হইতে পারিল না, মুখখানি নমিত করিয়া বলিল—ওসব স্তোক দেওয়া কথা। তাছাড়া ওতে আমার কিছুই তৃপ্তি হবে না;—যা হবার তা হয়ে গেছে, এরপর আর কখনো এমনি ভাবে আমাদের অপমান করবেন না, আজ যেমন কর্‌লেন।

নিরঞ্জন জোরে হাসিয়া উঠিলেন।

উত্তরা বলিয়া উঠিল—কিন্তু বেলা কারুর ধার ধারে না। খেতেই যদি হয়, গরীবের বাড়ীতে, সন্ধ্যেবেলায় খেয়ে আরো পাতকভাগী করবেন না।

নিরঞ্জন হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেলেন।—বেলা তখন প্রায় ন'টার কাছাকাছি।

উত্তরা তাড়াতাড়ি স্নান শেষ করিয়া উনুন ধরাইতে রান্নাঘরে ঢুকিল, এবং সেখানে মিনিট দুই তিন দাঁতে দাঁত চাপিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া অত্যন্ত বিষণ্নমনে পিতার নিকটে ফিরিয়া আসিল।

কন্যাকে এমন বিষাদ প্রতিমার রূপে রঘুনন্দন ইতিপূর্ব্বে একদিনও দেখেন নাই। কহিলেন—মুখখানা তোর ছাইয়ের মত শাদা কেন উত্তরা?…নিরঞ্জন বাবুর ব্যবহারে অতখানি মনঃক্ষুণ্ণ হওয়ার তো কারণ নেই মা!

উত্তরা কহিল—জীবনে আজ এ কি বিড়ম্বনা হল বাবা!…ভদ্রলোককে অনেকগুলো কথাই তো শুনিয়ে দিলাম, অথচ ভগবান যে এরই জন্যে আজ আমার ভাগ্যে কত বড় দণ্ড তুলে রেখে দিলেন, তা যে ঘুণাক্ষরেও জানতে পারি নি!

রঘুনন্দন অবশ্যই উত্তরোত্তর বিস্মিত হইতেছিলেন। কহিলেন—ভগবানের কাজের নাগাল কি মানুষে কখনো পায় মা! তা পেলেই যে মানুষ ভক্তিহীন হয়ে পড়ে।…কিন্তু কি হয়েছে?

—"উনুন ধরাতে গিয়ে দেখি কয়লা নেই!"…বলিয়াই উত্তরা চোখে আঁচল চাপা দিল।

রঘুনন্দন বুঝিলেন বাস্তবিকই ইহা অতীব কষ্ট ও দুর্নিবার লজ্জার হেতু!…জিজ্ঞাসা করিলেন—একদম কিচ্ছু নেই?

—যা আছে তাতে অত রান্না হবে না। তাছাড়া আমি তো গোড়ায় এত কাণ্ড জান্‌তে পারি নি।…কি হবে বাবা? হাতে যে আর একটা আধলাও নেই, থাক্‌লে এক্ষুণি আমি কয়লা কিনে আনতাম।

রঘুনন্দন চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুস্তর এ পারাবারে পড়িয়া,

কূল পাইবার চিন্তা—সে যে কত অসহায়ের চিন্তা,—তাহাও তাঁহার মনে পড়িল।

পার্শ্বে নিরঞ্জন বাবুর কাগজ পত্র রাখা ছোট স্যুটকেস্‌টা পড়িয়া ছিল। আপনার বিবেক বুদ্ধির অজ্ঞাতেই যেন কোন্ অনির্দ্দিষ্ট দৈবের সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে পরিচালিত হইয়া তিনি স্যুটকেসের তালাটা ধরিয়া টানিলেন এবং তাহা খুলিয়া গেল।

উত্তরা বিরক্ত হইয়া কহিল—ছি বাবা!

কিন্তু রঘুনন্দনের তখন শোনা-না-শোনা বা কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য সম্বন্ধে কোন কাণ্ডজ্ঞানই ছিল না। তিনি যে মনোবৃত্তি পরিচালিত হইয়া স্যুটকেশের তালা খুলিয়াছেন,—এখনও সেই মনোবৃত্তির আহ্বানেই ডালাটা খুলিলেন।—আঃ কী তৃপ্তি।···ভিতরে প্রায় কুড়ি টাকা পঁচিশ টাকা জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতেছে! এ যেন অভাবগ্রস্ত চিরতাপিত জনের—পীযূষ-প্রস্রবণ!

মাত্র একটি টাকা তুলিয়া লইয়া, উত্তরার দিকে হাতখানা বাড়াইয়া দিয়া রঘুনন্দন কহিলেন—দোকানে বলে আয়!—কয়লা দিয়ে যাবে।

ঝঙ্কার দিয়া তীব্র স্বরে উত্তরা বলিয়া উঠিল—টাকা রেখে দাও বাবা—আমি সব সহ্য করে চলেছি কিন্তু এটা কিছুতেই সহ্য করবো না।

—"তবে কি করবি?···" বলিয়া রঘুনন্দন বিরক্তভাবেই কন্যার দিকে তাকাইলেন।

তীব্র তেজের সুরেই উত্তরা বলিয়া উঠিল—একখানা একখানা করে পাঁজরার হাড় টেনে টেনে উনুন জ্বাল্‌বো, তবু চুরি করে—

রঘুনন্দন বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া লইলেন। আজ তাঁহার ইচ্ছা হইল—মৃত্যুই বুঝি বাঁচার চেয়ে পরম তৃপ্তির।

রঘুনন্দন যেরূপ মন লইয়া টাকা লইয়াছিলেন, আবার সেইরূপ মন লইয়াই উহা যথাস্থানে রাখিয়া সুটকেসটা বন্ধ করিলেন, এবং উদাস—উপায়হীনের দৃষ্টি মেলিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া কন্যার মুখপানে ঘন ঘন চাহিতে লাগিলেন।

উত্তরার ক্রোধ লোপ পাইল এবং একই সঙ্গে অনুতাপ ও দুঃখ আসিয়া সারা অন্তরখানি ছাইয়া দিল। হায় রে! একান্ত অসহায় ম্রিয়মাণ পিতা তার!...এক কন্যার জন্যই বার্দ্ধক্যের বিকট বিড়ম্বনাটুকু তাঁহাকে অহরহঃ সহিয়া যাইতে হইতেছে।

উত্তরা কহিল—নবু মুদীকে ব'লে আস্‌চি বাবা! অন্ততঃ সের দশেক কয়লা সে দেবেই।...

রঘুনন্দন কথা কহিলেন না। ক্লিষ্ট গম্ভীরতার মধ্যেও তাঁর নয়নের দৃষ্টি অর্থহারা।

উত্তরা ডাকিল—বাবা!

রঘুনন্দন আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন—আর এমন কাজ করবো না মা! আজকের মতন পারিস্ তো তোর বাবাকে মার্জ্জনা কর!

উত্তরা অনুতপ্ত কণ্ঠে কহিল—কেন বাবা? কিসের জন্যে?

—চুরি চুরি উত্তরা! তোর তস্কর বাপকে আজ মার্জ্জনা করিস্ মা!—অভাবের পাল্লায় প'ড়ে মনোবৃত্তি যে এতখানি হীন হ'য়ে পড়েছে—আজ তুই-ই তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলি উত্তরা!...আজকের মতন মাপ কর মা!

উত্তরা বাপের কাছে বসিয়া তাঁর কাঁধে হাত দিয়া বেদনার কণ্ঠে ডাকিল—বাবা!

রঘুনন্দন আপনাকে সংযত করিয়া লইলেন। কহিলেন—তবে

দোকানে বলে আয় মা!—বেলা যে দশটারও বেশী হ'তে চ'ল্‌লো!

কিন্তু একটা আকস্মিক শব্দে পিতা পুত্রী উভয়েই চকিতে ফিরিয়া দেখিলেন—তাঁহাদের পাড়ারই একজন কয়লাওয়ালা, এক বস্তা কয়লা আনিয়া উঠানে ফেলিয়াছে! শব্দ সেই কয়লা ফেলারই।

ব্রতী সঙ্ঘ গ্রন্থাগার
স্থাপিত ১৩৫১ সাল
ঘোষপাড়া, বালী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে নিরঞ্জনবাবু ফিরিয়া আসিলেন। এবারেও ঝাঁকা মাথায় তাঁর সঙ্গে মুটে এবং তাঁর নিজের হাতে প্রকাণ্ড একটা রুই মাছ।

রঘুনন্দন অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন দেখিয়া, উত্তরা অনুযোগ ও বিরক্তির সুরে বলিয়া উঠিল—তুমি তো কিছু ব'লবে না বাবা!—কিন্তু ওঁর এই দুপুর বেলায় এত সব আনা কেন? আমি যে লজ্জায় মরে যাচ্ছি!

নিরঞ্জন হাসিয়া কহিলেন—তবু রক্ষে! লজ্জা তো রমণীর শ্রেষ্ঠভূষণ। লজ্জা না থাকৃলে রমণীর সৌন্দর্য্য থাকতো না যে।...

উত্তরা তীব্র তেজে বলিয়া উঠিল—কিন্তু অপমান?—সেটাও কি রমণীর শ্রেষ্ঠভূষণ?...

নিরঞ্জন ব্যথিত কণ্ঠে বলিলেন—মার্জ্জনা কর উত্তরা! আমি অপমান হয় এমন ব্যবহার তো কিছু দেখিয়েছি ব'লে মনে পড়ে না।

উত্তরা কহিল—কিন্তু মনে পড়বার অবসর পেলেন কোথায় আপনি? এখানে আসার পর থেকে, এই কাণ্ডই তো করে চলেছেন। খালি খালি এত সব জিনিষপত্তর কিনে আনার যে কী আপনার আবশ্যক ছিল...বলিতে বলিতে সহসা রঘুনন্দনকে স্নেহসূচক ভর্ৎসনা করিয়া উঠিল—গরীব হ'লে কি তার মনও ছোট হ'য়ে যায় বাবা? একটা

কথাও কি তোমার মুখ থেকে আজ বেরুবে না!—খালি সকাল থেকে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌চো—একবারও তো কই বারণ করতে শুন্‌লাম না।

রঘুনন্দন অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—উনি যদি মানা না শোনেন, আমি তার কি করবো উত্তরা?...খোঁড়া পঙ্গু আমি, ওঁর সঙ্গে লড়াই করবার স্পর্দ্ধা তো আমার একটুও থাকা উচিত নয় মা!

নিরঞ্জন বাবু স্মিতমুখে বলিলেন—আপনারা কেন এত কুণ্ঠিত হচ্ছেন মুখুয্যে মশায়? একটুও আগেই যাকে আত্মীয় ব'লে স্বীকার করেছেন, তার সম্বন্ধে এতখানি ভুল ধারণা থাকা কি উচিত?...তা ছাড়া পাকা দেখা,...যখন আশীর্ব্বাদটাই করবো, তখন অনুষ্ঠানের ক্রুটী রাখবো কেন? গরীবরা অর্থই না হয় দিতে পারে না, কিন্তু শাস্ত্রকে বা সামাজিক আচার পদ্ধতিকে তো এড়িয়ে যাবার সাধ্য নাই তাদের।

কথাবার্ত্তার মাঝখানেই একটি অপরিচিত স্ত্রীলোক আসিয়া উঠানে দাঁড়াইতেই নিরঞ্জন বলিলেন—এই যে এসেচ,—নাও আর দাঁড়িয়ে থেক না বাছা!...তাড়াতাড়ি সব গুছিয়ে ফেলো। বেলা কি কম হ'ল? ...তারপর উত্তরার দিকে চাহিয়া বলিলেন—ঝিকে সব বুঝিয়ে সুঝিয়ে দাও—কি করতে হবে না হবে—

উত্তরার দেহখানা এক নিমিষে নিশ্চল হইয়া গেল! এযে বড়ই বাড়াবাড়ি!...আবার ঝির বন্দোবস্ত। কিন্তু তখনই এই বৃদ্ধের স্নেহ-পরায়ণতার কথা ভাবিয়া, মনের ক্ষুদ্র এক কোণে ঈষৎ তৃপ্তিরও আভাষ আসিতেছিল।

কিন্তু এই ঈষৎ তৃপ্তির উপরে নিরঞ্জনবাবুই আরও এক পর্দ্দা ভার চাপাইয়া দিতে, কহিলেন—আমার উপর রাগ করো না উত্তরা! যতই তোমাদের অপমান করি—তবু আমি তো মানুষ। এসব সইবো কোন্

শক্তিতে ?…মানুষ যতই নিষ্ঠুর নির্লজ্জ হোক্ উত্তরা !—কিন্তু স্নেহ-মমতা-হীন হ'তে সে কোন রকমেই পারে না—ব্রহ্মাণ্ডের তা নিয়ম নয়। এই দুপুর বেলায়, একটা মানুষের জন্যেই যে দুধের মেয়ে তুমি খেটে খেটে হয়রান্ হবে,—সে দৃশ্য কি মানুষ হ'য়ে কেউ চোখে দেখতে পারে? তা ছাড়া আমি বিশ্বাস করি,—তোমাদের অনাত্মীয়রূপে আর বোধ হয় আমি গণ্য হবো না।…যখন সামর্থ্য আছে, তখন কেন তা কাজে লাগবে না উত্তরা ?—একটা ঝির একদিন কি দু পাঁচ দিনের খরচ যোগানো,—সে ক্ষমতা আমি দস্তুর মতই রাখি।…কিন্তু আরও কি কথা কাটাকাটি করবার সাধ আছে তোমার ?…বলিয়া পকেট হইতে ঘড়ি খুলিয়া বলিলেন—দেখ্‌চো।—এগারটা।

ঝি উত্তরার কাছাকাছি আসিয়া সুমিষ্ট স্বরে বলিল—আগে মাছ কুট্‌বো না উনুন ধরাবো—বলে দাও দিদিমণি।

উত্তরার পরাজয়টা এইখানে সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। ঝির স্নেহসূচক সম্বোধনে আর সে অন্তরের মধ্যে কণামাত্র ক্রোধের স্থান দিল না।—কহিল—আগে উনুনটা ধরানো দরকার, কিন্তু আমি সেটা সেরে নিচ্ছি,—তুমি এদিক দেখ। বলিয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

নিরঞ্জন বাবু তখন রঘুনন্দনের জন্য সদ্য আনীত হুঁকা-কলিকা-তামাক প্রভৃতি এক এক করিয়া গুছাইয়া রাখিতেছিলেন।

রঘুনন্দন কহিলেন—আর আমাকে লজ্জা দেবেন না মশায়! আপনি বরং তেল মেখে স্নান করুন। আপনাদের সুখের শরীর, অত্যাচার-অনিয়ম বরদাস্ত হবে না।

হঠাৎ কেমন করিয়া যে নিরঞ্জনবাবু রঘুনন্দনের আনুগত্য স্বীকার করিয়া ফেলিলেন, তাহা তিনি নিজেই বুঝিতে পারিবেন না। তাঁর

সারা মনটা বিপুল উৎসাহের সহিত রঘুনন্দনকে শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখাইবার জন্যই সতত উন্মুখ হইয়া রহিল ।...

উত্তরা উনুন ধরানো শেষ করিয়া, ঝির নিকট আসিতেই সে বলিয়া উঠিল—দাদাবাবুকে নাইবার তেল দাও।...

উত্তরা ঈষৎ বিস্মিত ভাবে চাহিয়া বলিল—কার কথা ব'ল্‌ছো ?

—কেন দাদা বাবুর কথা,—উনি নাইতে যাবেন! আর বাবা ঠাকুর নাইবেন—আরো ঘণ্টাখানেক পরে।

উত্তরা খুসি হইল বটে, কিন্তু প্রৌঢ় নিরঞ্জনকে 'দাদাবাবু' আর তাহাকে 'দিদিমণি' সম্বোধন শুনিয়া তাহার মনটা বিরক্তি ও অবজ্ঞায় রি রি করিয়া উঠিল !...

নিরঞ্জন কহিলেন—আমায় একটুখানি তেল দাও তো উত্তরা !...

উত্তরার এতক্ষণ নজর পড়ে নাই, দেখিল একটা পাঁচ সের মাপের টিনে করিয়া সরিষার তেল এবং আড়াই সের মাপের টিনে ঘৃত আনা হইয়াছে।

বাক্যব্যয় না করিয়া সে টিন খুলিয়া ছোট বাটীতে তেল ঢালিয়া, নিরঞ্জনের সুমুখে রাখিল, তারপর অকুণ্ঠিত ভাবে বলিল—আমাদের গামছা কিন্তু বেজায় ছেঁড়া।

নিরঞ্জন ও রঘুনন্দন উভয়েই হাস্য করিলেন।

উত্তরা তাহাতে একটু অপ্রস্তুত হইল না। নীরবে ছিন্ন গামছা-খানিই আনিয়া দিল।

তেল মাখিতে মাখিতে নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করিলেন—রেশমের কাপড় আছে উত্তরা ?

উত্তরা গম্ভীর ভাবে জবাব দিল—না।

—যেমন তেমন ছেঁড়া—কোন রকমে পরা চলে—নেই ?

উত্তরা এবারেও গম্ভীর হইয়া বলিল—যদি থাক্‌তো, ছেঁড়াই থাক্‌তো। আস্ত কাপড় আমাদের একখানাও পুঁজি নেই। তা ছাড়া রেশমের একটুক্‌রা স্থতো খুঁজ্‌লেও ঘরে মিল্‌বে না।

নিরঞ্জন স্নানের জন্য উঠিয়া দাঁড়াইতেই, উত্তরা বলিল—ওদিকের ঐ চৌবাচ্চায় জল ভরা আছে।...আপনি চলুন, আমি ঘটী বাল্‌তি দিচ্ছি।

নিরঞ্জন কহিলেন—কলের জল ফুরিয়ে গেছে বুঝি ?

—হ্যাঁ, তা ছাড়া রাস্তার কলে তো আপনি নাইতে পারেন না। আমাদের খোলার বাড়ীতে জলের কল নেই।

নিরঞ্জন আর কথা কহিলেন না। উত্তরার নির্দ্দেশিত স্থানে গিয়া স্নান সমাপনান্তে রঘুনন্দনের একখানি শতছিন্ন কাপড় পরিধান করিয়া পুনরায় মাদুরে আসিয়া বসিলেন।

উত্তরা কহিল—মিনিট পাঁচ সাত দেরী করুন, আমি জল খাবার এনে দিচ্ছি।

নিরঞ্জন কহিলেন—আশীর্ব্বাদটা আগে শেষ করতে দাও।

রঘুনন্দন বলিলেন—ও-সব পরে হবে। আহারের পর আশীর্ব্বাদের প্রথা আমাদের দেশে আছে। আপনি ব্যস্ত হবেন না।...

* * * মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ করিতে প্রায় তিনটা বাজিয়া গেল।

রঘুনন্দন পূর্ণ পরিতৃপ্তির সঙ্গে তামাক টানিতে টানিতে কহিলেন—পেটে সহ্য হ'লে বাঁচি। অনেক কাল এমন ভাবের আহার তো ভাগ্যে জোটেনি কি না।

নিরঞ্জন কথা কহিলেন না।

ঝি একটা কলাপাতে করিয়া অনেকগুলি পান আনিয়া দিল।

নিরঞ্জন একটা কাগজের মোড়ক খুলিয়া একখানি সুন্দর শান্তিপুরে শাড়ী বাহির করিয়া, ঝির হাতে দিয়া বলিলেন—তোমার দিদিমণিকে এখানা পরতে দাও গে।...খাওয়া হয়ে গেছে তো?

—"হ্যাঁ" বলিয়া ঝি কাপড় লইয়া ঘরে ঢুকিল।

উত্তরার মনের মধ্যে আজ লক্ষ প্রশ্নের কূট দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। হঠাৎ এমনি ভাবের আত্মীয়তা—একি সত্য সত্যই নিরঞ্জন বাবুর আত্মীয়তা না তার অভিনয়? এ যে না চাইতে যাচিয়া সাধিয়া আকাশের চাঁদ-টাকেই হাতের উপর তুলিয়া ধরা!...

কিন্তু পিতার ম্লান মুখচ্ছবি, তাঁর দুর্ব্বল অন্তরের বেদনা—স্মরণে আসিতেই, উত্তরা মনকে কোন প্রকারেই সন্দেহের মাঝে ছাড়িয়া দিতে চাহিল না। নিরঞ্জন প্রদত্ত কাপড়-জ্যাকেট পরিধান করিয়া, ডাকের অপেক্ষায় গৃহ-মধ্যে বসিয়া রহিল।

এমনি সময় রঘুনন্দন হাঁক দিলেন—ঝি! তোমার দিদিমণিকে সঙ্গে করে নিয়ে এসো তো মা!...আর ঐ-সঙ্গে ধান-দুর্ব্বার থালাটাও আনতে হবে।

...নিরঞ্জন বাবু উত্তরার মাথায় ধান-দুর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

উত্তরা মাথা নোয়াইয়া নমস্কার জানাইল।

নিরঞ্জন কহিলেন—ভগবানের নামে শপথ করে, আজ থেকে তোমার ভার নিলাম,—তুমি গৃহলক্ষ্মীর আসনে ব'সে আমার আঁধার ঘর আলো কোরো।

উত্তরার সারা বুকখানা আকস্মিক বজ্রাঘাতের আঘাত খাইয়াই যেন স্পন্দনহারা হইল!...এ কি নিষ্ঠুর পরিহাস!...ইহার অর্থই বা কিরূপ!

রঘুনন্দন বিশেষ কিছুই কহিলেন না। কিন্তু নিরঞ্জন তাঁহাকে বলিলেন—আপনি আশীর্ব্বাদ করুন।

রঘুনন্দন ধানদূর্ব্বা লইয়া কন্যার মস্তকে অর্পণ করিলেন। তাঁহার হাতটা একবার কোন্ এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় মুহূর্ত্তের তরে কাঁপিয়া উঠিল ;—কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্যই !

রঘুনন্দনের আশীর্ব্বাদ করা শেষ হওয়া মাত্রই, ব্যগ্রকণ্ঠে নিরঞ্জন বলিয়া উঠিলেন—আপনি আমার প্রতি নিদয় হবেন না। আমাকেও আশীর্ব্বাদ করুন।

রঘুনন্দনের বাঁ হাতের হুঁকাটা ঠক্ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল এবং জলে স্থানটুকু ভিজিতে লাগিল।...

কাহারও মুখে কথা ছিল না। উত্তরা নির্ব্বাক্ হইয়া কাঠগড়ায় আসামীর মতই ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল।

নিরঞ্জন পুনরায় কহিলেন—ভাবচেন কেন? আজ থেকে আমিও যে আপনার পুত্রস্থানীয় হ'লাম। উত্তরার স্বামী—সে কি আপনার পর হ'য়েই থাকবে ?

একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া উত্তরা চঞ্চল চরণে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আর রঘুনন্দন উন্মাদ দৃষ্টিতে নিরঞ্জনের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।...আজ যেন ভবের হাটে বেচাকেনা করিতে আসিয়া, ঢাকি শুদ্ধই বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছে।...হায় হায়! নিষ্ঠুর নিয়তির এ কী মর্ম্মদাহী কঠোর কৌতুক! চিরলাঞ্ছিত জীবনে এ কী বীভৎস নূতনত্ব!

নিরঞ্জন কহিলেন—উত্তরার রূপমুগ্ধ আমি, শুধু তাই নয়—গুণ দিয়েও সে আমায় মোহিত করেছে। আমার শূন্য ঘর, আপন ব'লতে কেউ

সেখানে বেঁচে নেই।...তাই স্বেচ্ছায়, মনের সাধ অপূর্ণ রাখবার প্রবৃত্তি না হওয়ায়, উত্তরাকে সহধর্ম্মিণী করতে প্রতিশ্রুত হ'লাম।...আজ থেকে আপনি আমার পরম গুরু। সুতরাং আশীর্ব্বাদ করে ধন্য করুন।

যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার মতই রঘুনন্দন দক্ষিণ হস্ত ধীরে নিরঞ্জনের মস্তকোপরি উত্তোলিত করিলেন—কিন্তু মুখে বাক্য নির্গত হইল না।

রঘুনন্দনের যখন কথঞ্চিৎ চিন্তাশক্তি ফিরিয়া আসিল, তখন কন্যার ভস্মমলিন মুখখানা দেখিবার জন্য তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন, কিন্তু আপন মুখখানা সেখানে কেমন করিয়া প্রকাশ করিবেন—এই দুঃসহ কুণ্ঠাতে স্থাণুর মত সেখানেই বসিয়া রহিলেন। এক পাও নড়িতে পারিলেন না।

নিরঞ্জন রঘুনন্দনের পায়ের কাছে দুখানি দশ টাকার নোট রাখিয়া প্রণাম করিলেন। তার পর ধীরে ধীরে নম্র বচনে কহিলেন—আজ থেকে সাত দিন পরে এই মাসের ২৮শে তারিখে ভাল দিন আছে, বাজারে গিয়ে পঞ্জিকা দেখেছি।...ঐ দিনেই শুভ কাজ শেষ করা হবে।

রঘুনন্দন হাঁ-না কোন কথাই কহিলেন না। একটু একটু করিয়া তাঁহার সমস্ত মন আশঙ্কায় ভরিয়া উঠিতেছিল।—অভিমানিনী উত্তরাকে কোন্ লজ্জায় মুখ দেখাইবেন আজ! একবার ইচ্ছা হইল—হিতৈষী গোবিন্দবাবুকে সংবাদ দিয়া তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিবেন। কিন্তু সংবাদ দিতে যাইবার লোক কোথায়?...

নিরঞ্জন চিন্তিত হইয়া কহিলেন—আমাকে কি আপনাদের পছন্দ হ'ল না?...কিন্তু ধনে মানে ঐশ্বর্য্যে আমি বিশেষ ছোট নই।...আপনার সাধ্যের অতিরিক্ত চেষ্টাতেও আমার মত পাত্র জুটতো না।—এ আমি হলপ্ করে ব'লতে পারি।

দীর্ঘশ্বাস মোচনান্তে রঘুনন্দন কহিলেন—যাক্, যখন আর উপায় নাই, তখন দুঃখ মিছে।

নিরঞ্জন উঠিয়া ধীর পাদবিক্ষেপে উত্তরার সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলেন—সন্ধ্যে হ'য়ে আস্‌চে। আমি চল্‌লাম উত্তরা!...আমার ঠিকানাটা লিখে রাখো...নং অখিল মিস্ত্রীর গলি।

উত্তরা কোন কথাই বলিল না। ঠিকানা লিখিবার জন্য বিন্দুমাত্র উৎসাহ বা ইচ্ছা দেখাইল না।

নিরঞ্জন আরো দুখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া উত্তরার সুমুখে রাখিতে রাখিতে কহিলেন—টাকাটা তুলে রাখো। বিপদ-আপদ মানুষ মাত্রেরই আছে। তাছাড়া কাকের মুখে সংবাদ পাঠা'লেই আমি ছুটে চ'লে আস্‌বো। নির্ভাবনায় থেক।...ভালয় ভালয় এই সাতটা দিন কেটে গেলে দুশ্চিন্তা ঘোচে।

উত্তরা ক্রূর দৃষ্টি মেলিয়া নিরঞ্জনের পানে চাহিতেই, তিনি দুই পা পিছাইয়া আসিলেন।

উত্তরা কহিল—আপনার টাকা, আপনারই কাছে থাক, সকাল থেকে তো যথেষ্ট অপমান করলেন,—তবু আপনার সাধ মিট্‌লো না? এর পরেও কি আর কিছু অভিনয় বাকী আছে?

নিরঞ্জন টাকা লইয়া ফিরিয়া আসিলেন, একটি কথাও আর বলিতে পারিলেন না। এ টাকাও রঘুনন্দনের হাতেই দিলেন।

সন্ধ্যার গাঢ় আঁধার দিকে দিকে প্রসারিত হইতেই উত্তরা গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বসিল।...মাথাটায় অসহ্য যন্ত্রণা! বুকের উপর কে যেন পর্ব্বত-প্রমাণ পাষাণ ভার চাপাইয়া দিয়া গিয়াছে! সব থাকিতে এমন ভাবে সর্ব্বস্বান্ত হওয়া—এ—ই কি তবে বিধাতার অভিপ্রেত আজ?—

আশীর্ব্বাদ সারা…আজ সে এক প্রৌঢ় কামুকের বাক্‌দত্ত!…কিন্তু না-না-না!—ওগো—কোন রকমেই তা হইবে না—হইতে সে দিবে না… প্রবঞ্চকের মোহাকৃষ্ট হইবার মত মানসিক অবস্থা তার কথনো ছিল না—এখনো নাই। জীবনভর গ্লানির দুর্ব্বিষহ বেদনা মাথায় বহিয়া জীবনের শোক-সুখ-সান্ত্বনা-সম্পদের সঙ্গে প্রাণপণে লড়াইতেও সে পশ্চাৎপদ নহে, কিন্তু প্রতারককে, অত্যাচারীকে সাহসে ভর দিয়া সহসা কাছে আনিতে সে কেন দিবে আজ?

রঘুনন্দন ডাকিলেন—মা—মা!—উত্তরা!

কী গম্ভীর ব্যথাভরা আর্ত্ত কণ্ঠস্বর!…এই ভগবানের দরবারে—চির অভিশাপপ্রাপ্ত অক্ষম বৃদ্ধেরও আজ কন্যা হইতেই বুঝি হীন এ পরিণতি!…দুঃখের সপ্তসিন্ধু কানায় কানায় ভরিয়া গেছে,—মরণ-নদীর দুকূল ছাপাইয়া প্লাবনের পর প্লাবন ছুটিয়াছে!…এ দুরতিক্রম্য বিধিলিপির লৌহ কর-পরশে হীন-বল উত্তরা আর কতকক্ষণ আপনাকে খাড়া রাখিবে? নিজে খাড়া থাকিয়া অক্ষম আতুর পিতাকে সান্ত্বনার বাণী শুনাইবে—আজ কোন্ শক্তিতে সে?

রঘুনন্দন পুনরায় ডাকিলেন—উত্তরা!

উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে উত্তরা বলিল—কেন বাবা?

—একবারটি আয় মা! আমার কাছে আয় একবার।

উত্তরা টলিতে টলিতে পিতার কাছে আসিয়া বসিতেই, রঘুনন্দন কন্যাকে গাঢ় স্নেহে চাপিয়া ধরিয়া দীর্ণ কণ্ঠে বলিলেন—অক্ষম,—অতি অভাগা তোর বাপ, অভিশপ্ত দেখে, যে-সে, যখন তখন দশরকমের দশ অভিনয় দেখিয়ে যায়। পারিস্ তো তার প্রতীকার কর মা!…আমি চির-দুর্ব্বল—চির-অথারগ!

উত্তরা ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

রঘুনন্দন কহিলেন—চোখের জলে কোন কাজই এ সংসারে আর হয় না উত্তরা।...চাই তেজ,—রুদ্র তেজ!

কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তরা বলিল—কিন্তু এ যে শাস্ত্রের বিধান বাবা!—এ কি পাল্‌টানো চলে?...সামাজিক বিধি-নিষেধের গণ্ডী পার হওয়া কি দুর্ব্বলের কাজ বাবা?

রঘুনন্দন নীরবে বসিয়া রহিলেন!

উত্তরা তাঁর গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে ডাকিল—বাবা!

—কেন মা?

—যা হ'য়ে গেছে,—তা আর ফিরবে না। অদৃষ্ট ছাড়া তো দুনিয়ায় কারুর পথ নেই বাবা!

—তুই মেনে নিচ্ছিস উত্তরা?

—হাঁ বাবা!

—নিচ্ছিস মেনে?—নিলি?...দ্বিধা নেই আর?

—না বাবা!...হাতের কাছে যখন কোন উপায়ই খুঁজে মেলে না, তখন ভবিতব্যকে তার আসন ছেড়ে দিতে হয়।

—তা হলে তোর আর আপত্তি নেই উত্তরা?

—না বাবা।

একটা মুক্তির দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া রঘুনন্দন বলিলেন—আজ আমায় বাঁচালি উত্তরা!—এখন যদি মৃত্যু আসে, জানবো সে মৃত্যু আমার স্বর্গের তুল্য।

উত্তরা কোন কথা বলিল না। ধীরে ধীরে পিতার মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিল।

স্নেহ-করাঙ্গুলিস্পর্শ পাইয়া রঘুনন্দন্ তন্দ্রাভিভূত হইলেন।

উত্তরা বসিয়া আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতে লাগিল। তাহার অভিশপ্ত ভাগ্যে আরো যে কতই ঘটনা-বৈচিত্রের অপূর্ব্ব সমাবেশ হইবে তাহা তো সে কল্পনাতেও আঁকিতে পারে না।—অদৃষ্ট সে চিরদিন অ-দৃষ্ট!

ক্ষুদ্র অঙ্গনের তুলসী-বেদীমূলে এক ঝলক্ জ্যোৎস্না আসিয়া লুটোপুটি খাইতেছিল, সেই দিকে চাহিয়া উত্তরার মনে হইল—চাঁদের হাসি—তারার আলো—অশ্রান্ত পাপিয়ার মধুসঙ্গীত—এ সব তার সদা জাগ্রত নয়ন-শ্রবণের আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু ভাগ্যের বিড়ম্বনায় ভোগ করিবার অবসর আসে না।

বাহির দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ আসিতেই, সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল···তাইতো, রাতের বেলায় আবার, কেমন দুঃখ দু'হাত বাড়াইয়া অগ্রসর হইতেছে—কে জানে?

ভয়ে ভয়ে সাড়া দিল—কে?

—রঘুনন্দন মুখুয্যের এই বাড়ী?

—হ্যাঁ, কে আপনি?

—দরজাটা খুলে দাও।

—আপনি কে?

—আমি গোবিন্দবাবুর ওখান থেকে আস্‌চি।

—কি দরকার? তিনি কি নিজে এসেচেন?

—তাঁর সাংঘাতিক অসুখ। একবার মুখয্যে মশায়ের সঙ্গে দেখা করতে চান।

উত্তরার ঘা-খাওয়া বুকে নূতন এক সন্দেহ উঁকি মারিতেছিল। দরজা না খুলিয়া, সে পিতাকেই জাগাইয়া দিল।

রঘুনন্দন জিজ্ঞাসা করিলেন—কি ?

—কে একজন ডাক্‌ছে বাবা ! বলে—গোবিন্দ বাবুর খুব ব্যারাম, তোমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন ।

রঘুনন্দন চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিলেন। উত্তরাকে বলিলেন—দরজাটা খুলে দেখ্ ।

উত্তরা ভয়ে ভয়ে দরজা খুলিতেই, লোকটি ভিতরে আসিয়া বলিল—মুখুয্যে মশায় !—গোবিন্দ বাবুর খুব ব্যারাম, আপনাকে এক্ষুণি যেতে বলেছেন ! রাত্রি কাটে কি না সন্দেহ ।

রঘুনন্দন ব্যথিত কণ্ঠে বলিলেন—সবই আমার অদৃষ্ট। জগতে এই আমার একটী মাত্র হিতৈষী ছিলেন ।…কিন্তু আমি খোঁড়া—পঙ্গু…কেমন ক'রে—

—বাহিরে তাঁর গাড়ী রয়েচে। আসুন, আপনাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছি। আবার পৌঁছে দিয়ে যাবো ।

রঘুনন্দন কন্যার পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—একা থাকৃতে পারবি তো মা ?…

উত্তরার বুকে ভয়ের আর সীমা পরিসীমা ছিল না, তবু সে স্থির কণ্ঠে জানাইল—পারিবে। তারপর পিতাকে বাহিরে যাবার জন্য চাদর আনিয়া দিল ।

আগন্তুকের সাহায্যে উঠিতে উঠিতে রঘুনন্দন বলিলেন—রাত্রে আর খাবো না আমি। কিন্তু তুই কি করবি ?…খাবার কিছু…

উত্তরা কহিল—সে তোমার ভাবতে হবে না বাবা ! ঘরে অনেক জিনিস পত্রই তো মজুত আছে ।

অতিশয় উদ্বিগ্ন রঘুনন্দন পীড়িত গোবিন্দ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে রওনা হইয়া গেলেন ।

(উত্তরা ঘরের মেঝেয় আঁচল বিছাইয়া শুইয়া পড়িল। রাজ্যের দুর্ভাবনা, অশান্তি, ভয় একই সঙ্গে ছুটিয়া আসিয়া তাহার আকুল চিত্তকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল।)··

রাত্র ক্রমেই বাড়িয়া চলিল, কিন্তু রঘুনন্দন ফিরিয়া আসিলেন না।

উত্তরা দুশ্চিন্তার মধ্যে আপন অন্তরকে প্রবোধ দিল—রোগ গুরুতর, রোগী স্বেচ্ছায় সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছেন,—বোধ হয় সেই জন্যই পিতার ফিরিতে বিলম্ব হইতেছে। ইহার জন্য ভাবিবার কিছুই নাই।...

কিন্তু যদি পথের মাঝে, ফিরিবার সময় কোন বিপদ ঘটিয়া পড়ে, যদি কোন শত্রুর আক্রমণে—না না ইহাও কি সম্ভব? দীন—ভিখারী, সম্পূর্ণ ভাবে পরপ্রত্যাশী তাহারা, তাহাদের ত্রিসংসারে আবার শত্রু কেন থাকিবে?···স্নেহ সর্ব্বদাই বিপদ ডাকিয়া আনে!—উত্তরার মিথ্যা এ আশঙ্কা—নিতান্ত অমূলক।

দূরের এক জমীদার-বাড়ীতে ঢং ঢং করিয়া দশটা বাজিয়া গেল।··· উত্তরার চিত্ত ক্রমশঃই অশান্ত হইয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া উঠানে নামিল। তারপর উর্দ্ধে চাহিয়া দেখিল— মাথার ঠিক উপরে চাঁদ! মাঝে মাঝে দু' একটি ক্ষীণ নক্ষত্রের মৃদু হাসি।

উত্তরা ধীরে ধীরে দরজা খুলিয়া বাড়ীর বাহিরে আসিল, তারপর দরজায় শিকল টানিয়া দিয়া, এক পা এক পা করিয়া বড় রাস্তার মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইল।...

রাস্তা নির্জ্জন হইয়া আসিতেছে। কদাচিৎ এক আধখানা রিক্সা বা মোটর গাড়ীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

একটা গ্যাস-পোষ্টে হেলান দিয়া, উত্তরা সুমুখের পথটার পানে

অন্তিম শয্যায় ইন্দুমতীর অনুতাপমলিন পঙ্কজ কুমার

একাগ্র দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। এ বিশ্বসংসারের মাঝে আজ যেন সে সত্য সত্যই অনাথা কাঙালিনী !...আজ সে সত্য সত্যই একা !...

পথ দিয়া দুইটি যুবক যাইতেছিল। উত্তরাকে এই ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, তাহারা দুজনেই কাছে আসিল এবং গ্যাসের আলোতে চাহিয়া দেখিয়াই, বিস্মিত ভাবে বলিয়া উঠিল—এখনো বাইরে কেন ?

উত্তরা চিনিল। এই পাড়ারই লোক। অধিক রাত্রে কাজ শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিতেছে। বলিল—আমার বাবা এখনো বাইরে রয়েচেন। ফির্‌তে বড্ড দেরী দেখে পথে দাঁড়িয়ে রয়েচি।

—কোথায় গেছেন ?

—চরকডাঙ্গায়—গোবিন্দ বাবুর বাড়ীতে। তাঁর খুব ব্যারাম, তাই দেখ্‌তে গেছেন।

সান্ত্বনার সুরে একজন বলিল—তার জন্যে ভাবনা কেন ? তুমি ঘরে যাও। রুগীর কাছে গেছেন, সেই জন্যেই বোধ হয় ফিরতে দেরী হচ্ছে।

উত্তরার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল। গলা ঝাড়িয়া বলিল—গেছেন সন্ধ্যেবেলায়। আমি একা বাড়ীতে রয়েচি, এত রাত হবার কারণ নেই, অথচ কেন যে—

যুবকদ্বয়ের একজন বলিল—আচ্ছা তুমি ঘরে যাও, আমি খোঁজ নিয়ে আস্‌চি।—

প্রতিবেশীর এই সহানুভূতিতে উত্তরা নিশ্চিন্ত হইলেও, তখনি বাটী ফিরিতে পারিল না, আরো কিছুক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

যুবকদ্বয় তখন দুই জনে দুই পথ ধরিয়াছে। একজন বাসার পথে, অন্য জন—চরকডাঙ্গা যাইবার পথে।...

আরো আধঘণ্টা কাটিয়া গেল, রাস্তা প্রায়ই নির্জ্জন। উত্তরার আশা-ভরসা—প্রতিবেশী যুবকটি যাহা হয় সংবাদ আনিয়া দিবে।

বাটী ফিরিবার জন্য গলির মুখে ঢুকিতেই, পশ্চাৎ হইতে কে জিজ্ঞাসা করিল—বলতে পারো, এই গলিটার কি নাম? কোথায় লেখা রয়েচে দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

উত্তরা ফিরিয়া চাহিল। দেখিল সুবেশধারী জনৈক ভদ্র-যুবা। চোখে চশমা, হাতে একখানা কাগজ, সম্ভবতঃ সংবাদ-পত্রই।

উত্তরা খুব নিম্নকণ্ঠে গলির নাম বলিয়া, সামান্যক্ষণ ভদ্রতার খাতিরে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর পুনরায় অগ্রসর হইল।

যুবকটী খুব ভদ্রভাবেই আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল—রঘুনন্দন মুখুয্যে নামে কেউ এই গলিতে থাকেন?...

উত্তরা ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাহার বুকখানায় কে যেন আকস্মিক একটা ভারি হাতুড়ির ঘা মারিয়াছে! কোনো রকমে সে জবাব দিল—আমার বাবার নাম রঘুনন্দন মুখুয্যে। বলিয়াই আর কোন কথা সে কহিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিবার অনেক কিছু থাকিলেও, লজ্জা আসিয়া জোরে বাধা প্রদান করিল।

যুবক জিজ্ঞাসা করিল—তিনি ভাল আছেন?

"হ্যাঁ" বলিয়া উত্তরা এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

যুবাটিও ঠিক উত্তরার পিছনে পিছনে যাইতেছিল। অথচ বর্ত্তমান অবস্থায় উত্তরা তাহাকে কোন প্রকারেই জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না যে, কেন আপনি আসিতেছেন!

বাড়ীর নিকটে আসিয়া দরজার শিকল খুলিয়া, উত্তরা ভিতরে প্রবেশ করিয়াই দেখিল—পথের পথিক তার সম্মুখে দাঁড়াইয়া!

সে 'না' বলিতে পারিল না। 'আসিয়ো না' বলিয়া ফিরাইতেও পারিল না, 'কেন আসিতেছ' বলিয়া প্রশ্ন করিতেও পারিল না।...বিনা বাক্যব্যয়ে পথ ছাড়িয়া দিয়া, মূক অভিনন্দন দানে যুবককে অভিনন্দিত করিল।

যুবাটি ভিতরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—দরজাটা কি বন্ধ করতে হবে?

উত্তরা কোনো প্রকারে জবাব দিল—দিন বন্ধ করে। তার পর সে ঘরে আসিয়া আলো জ্বালিল এবং নিরুপায় হইয়াই বাহিরের দাওয়াতে মাদুর বিছাইয়া দিল, কিন্তু যুবককে বলিল না যে,—"বসুন!"

যুবক না বসিয়াই জিজ্ঞাসা করিল—রঘুনন্দন বাবু কোথায় আছেন?

মাথা নত করিয়া উত্তরা কহিল—তিনি বাইরে গেছেন।

যুবক অপ্রতিভ ভাবে বলিয়া উঠিল—আমাকে মার্জ্জনা করবেন।—আমি তাহলে ভুল ক'রেছি।...বলিয়াই আলোর সাম্‌নে হাতের কাগজখানি খুলিয়া দেখিতে লাগিল।

উত্তরা দেখিল তাহাতে লেখা আছে—

"জনৈক দুঃস্থ অসমর্থ চলচ্ছক্তিহীন বৃদ্ধ কন্যাদায়গ্রস্ত। অনশনে অর্দ্ধাশনে দিনযাপন করেন। তাঁহার এই বিপন্ন অবস্থায় কোন সহৃদয় ব্যক্তি কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিয়া, তাঁহাকে মরণে শান্তি দিন—ইহাই মাত্র কামনা। আশীর্ব্বাদ করিবার ভার ভগবানের উপর।"

কাগজখানি মুড়িতে মুড়িতে যুবক উত্তরার পানে চাহিয়াই আবার চক্ষু নমিত করিল। বলিল—ভুল তো আমি করিনি।...এই গলি, বাড়ীর নম্বরটাও এই, অথচ...

উত্তরা কথা না কহিয়া থাকিতে পারিল না। বলিল—আপনি ঠিক জায়গাতেই এসেচেন, কিন্তু বাবা বাইরে গেছেন।

যুবক বিস্মিত হইয়া বলিল—তবে যে বিজ্ঞাপনে লেখা রয়েচে—চলচ্ছক্তিহীন। তিনি হাঁটতে পারেন?

—না, তাঁর একজন বন্ধুর মরণাপন্ন অবস্থা, তাই তাঁরই গাড়ী এসে বাবাকে সেখানে নিয়ে গেছে। আস্‌তে দেরী হচ্ছে দেখে, আমি বড় ভাব্‌চি। সেই জন্যেই পথে গিয়ে দেখ্‌ছিলাম—কতদূরে আস্‌চেন।

যুবা কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া কহিল—ও, তাহ'লে আমি ঠিক জায়গাতেই এসে পড়েছি।...কিন্তু যদি অভয় দেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

উত্তরা মুখে কিছু না বলিলেও, যুবকের প্রশ্ন করিবার ভূমিকা শুনিয়া সম্মতিসূচক ভঙ্গী করিল।

যুবক জিজ্ঞাসা করিল—আপনিই কি রঘুনন্দন বাবুর মেয়ে?—আর বিয়ে দেওয়ার জন্যে তিনি...

অত্যধিক লজ্জায় উত্তরার মুখখানা অসম্ভব রকমে নমিত হইয়া পড়িল।

যুবা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—এখনও বিয়ের কিছু ঠিকঠাক হয়নি?

উত্তরা এবারেও যেন কিছুই জবাব দিতে পারিল না।

যুবাও আর জিজ্ঞাসা করিবার মত কোন কিছুই খুঁজিয়া পাইতেছিল না, যেহেতু—প্রশ্নের পর প্রশ্ন বর্ষণ করিয়া লাভ কি?

অনেকক্ষণ দুজনেই নীরবে বসিয়া থাকার পর, যুবক কহিল—আপনাকে মিছি মিছি আড়ষ্ট ভাবে বসিয়ে রাখবো না, আমি উঠ্‌লাম।

উত্তরা ক্ষুব্ধ হইল। কহিল—বাবার যে কেন এত দেরী হচ্ছে।... ভা-রি ভাবনা হ'য়েচে আমার।...

—অসুখ দেখ্‌তে গেছেন। তার ওপর অন্তরঙ্গ বন্ধু, কথাবার্তায় দের—

হচ্ছে ;...কিন্তু তিনি ফিরে এলে ব'লবেন—বিয়ে সম্বন্ধে যদি কোন কথা কইবার প্রয়োজন থাকে, তাহ'লে···নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে...বেল্‌গেছে মেডিকেল কলেজের হোষ্টেলে গেলেই সম্ভবতঃ ঠিকঠাক হ'য়ে যাবে।··· পয়সা কড়ির খরচ নেই। পাত্রটি এই বছর ডাক্তারী পরীক্ষা দেবে, পাশ হবার যোল আনা আশা আছে। তা ছাড়া দেশে জমিদারী আছে। মা আছে, বাপ নেই।···

উত্তরার আর চুপ করিয়া থাকা চলিল না। কিন্তু দুই দিকের লজ্জা আসিয়া তাহাকে নির্ব্বাক্ করিয়া দিল। প্রথম, বিবাহের সম্বন্ধে যে কথা, তাহাতে কথা দেওয়ার লজ্জা, দ্বিতীয়—এতকথা সে বাবার সম্মুখে মেয়ে হইয়া কেমন করিয়া প্রকাশ করিবে? কিন্তু উত্তরাকে বলিবার সম্পূর্ণ ভার দিয়া নিশ্চিন্তভাবেই যখন যুবক অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিল, তখন এই নিশ্চিন্ততার মাঝে সন্দেহ ঢালিয়া না দিয়া, উত্তরা কোন প্রকারেই স্থির থাকিতে পারিল না। কেন না সে স্থির জানিয়াছিল, পিতার কাছে এই সমস্ত কথার একটিও সে বলিতে পারিবে না। প্রাণ গেলেও না।

উত্তরা বলিল—আপনি আর একটুখানি বসুন না, বাবা তো আস্‌বেনই। বলিয়াই সে অতিরিক্ত লজ্জায় মাথা হেঁট করিল।'

যুবা হাতের রিষ্টওয়াচট্‌ার দিকে দৃষ্টি ফেলিয়া বিস্মিতভাবে বলিয়া উঠিল—কি সর্ব্বনাশ! এ যে সাড়ে এগারোটা!···না আর তো আমি দেরী করতে পার্‌বো না।—আপনিই গুছিয়ে ব'লবেন।

উত্তরা এবারে কোন মতে বলিল—আপনি বরং লিখে রেখে যান। বাবা এলে আমি তাঁকে দেখাবো···

—"কিন্তু আর কোন সম্বন্ধ হয়নি তো?" বলিয়া যুবক নির্নিমেষে মুগ্ধ নেত্রে উত্তরার উজ্জল মুখখানির পানে চাহিল।

উত্তরাও চাহিয়া চক্ষু নত করিয়া ফেলিল। কিন্তু কোন কথা কহিল না।

যুবক বলিল—আমার নাম মনতোষ ঘোষাল। মেডিকেল কলেজের হোষ্টেলে আমি থাকি। আমার নাম করে গেলেই সব ঠিক হবে।

উত্তরা আবার চক্ষু মেলিয়া মনতোষকে দেখিয়া লইল।··হাঁ মনতোষই তো! (মনকে তুষ্ট করিবার মত সুদর্শন দেহধারী বটে)···

মনতোষও উত্তরার পানে চাহিল। বিধাতার মনে কি আছে,—উভয়েই কিছু জানে না, অথচ পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করিতেও বিরত হইল না। যেন দুজনেই অনিচ্ছায় চাহিতেছে। অথচ এই চাওয়াটাই তাহাদের শ্রেষ্ঠ কামনার।

মনতোষ বলিল—হোষ্টেলের গেট বন্ধ হ'য়ে গেলে রাত্রে আমার খুব কষ্ট হবে। সেই জন্যে আরও তাড়াতাড়ি।—আপনি অনুগ্রহ করে যদি বলেন···ব'লবেন—বিজ্ঞাপন দেখে একজন ভদ্রলোক এসেছিলেন। মেডিকেল হোষ্টেলে থাকেন। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে,—বেলগেছে কলেজের হোষ্টেল। বাস, আর আপনাকে কিছু ব'লতে হবে না।

তথাপি উত্তরা বলিল—যখন এতখানি সময় থাকলেন, তখন আরো মিনিট দশ বারো অপেক্ষা করুন। বারোটা বাজুক।...এতরাতে একলা আমি আর কথনো থাকিনি।

মনতোষের অন্তরটা দুলিয়া উঠিল! আহা! বেচারী!···সত্য কথাই তো,—এই পরম লাবণ্যময়ী তরুণী সুন্দরী, একলা ঘরে—নির্জ্জন বাড়ীতে, কাহার ভরসায় ভরসা রাখিবে?..(দেশ-কাল-পাত্র—কোনটাই এখনকার ভাল নয়।)

মনতোষ বলিল—কিন্তু যদি বাসায় ফটক বন্ধ হ'য়ে যায়, কোথায়

দাঁড়াবো ?···এই কল্‌কাতা সহরে, সারারাত পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হবে তো ?

উত্তরার কুণ্ঠার ভার ক্রমশঃই কাটিয়া যাইতেছিল। কহিল—যদি গরীবের বাড়ী ব'লে অবজ্ঞা না করেন, আমাদের এই স্যাঁৎসেঁতে বাড়ীতে আপনার ঘুম আসে—

—বস্ বস্...চুপ করুন।···লৌকিকতাটা আমি সব সময়ে পছন্দ করি না।···যাক্, তাহ'লে নিশ্চিন্ত হ'য়ে অপেক্ষায় রইলাম। আসুন তিনি যখন আসবেন।

...তারপর অদূরে পেটাঘড়িতে শব্দ পাওয়া গেল—বারোটা বাজিতেছে।

মনতোষ কহিল—উঃ—কখন্ কি ঘ'টে যায়!...এতক্ষণ ট্রেণে চেপে কত দূরেই চ'লে যেতাম!...

উত্তরা কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না বটে, কিন্তু জানিবার অদম্য স্পৃহা তার নয়নের দৃষ্টিতে স্পষ্ট প্রতিভাত হইল।

মনতোষ কহিল—কাল সকালের মধ্যে আমাকে দেশে পৌঁছুতে হ'ত, হাট বাজার করা যায় টিকিট পর্য্যন্ত খরিদ হ'য়ে গেছে,···কিন্তু ভবিতব্য... যাওয়া হ'ল না, জুতোর দোকানে জুতো কিন্‌তে গিয়েই বিভ্রাট বেধে গেল।···অথচ আমি একে বিভ্রাট ব'লতে একটুও আর রাজী নই।

উত্তরা কহিল—দেশে গেলেন না কেন ?

মনতোষ বলিল—ঐ তো ব'ললাম, জুতো কিন্‌তে গিয়েই সব গোলমাল হয়ে গেল।···দেশে আমার একটি খুব আদুরে চাকর আছে।···তার জন্যে একজোড়া জুতো কিন্‌তে গেছলাম। কিনে, কাগজে মুড়া জুতোর মোড়কটা হাতে করে 'বাসের' জন্যে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ মোড়কটার

একজায়গায় নজর পড়তেই···বলিতে বলিতে হাতের সেই সংবাদপত্রখানা মেলিয়া ধরিয়া কহিল—দেখ্ছেন না, কাগজখানা কি রকমে মুচড়ে রয়েচে। আপনার বাবার দেওয়া বিজ্ঞাপন চোখে পড়বামাত্র আমার মন-মেজাজ এতই খারাপ হ'য়ে উঠলো যে, সঙ্গে সঙ্গে একখানা 'বাসে' উঠে পড়লাম। তারপর জুতো জোড়া খুলে রেখে কাগজখানার তারিখটা বার কতক উল্‌টে পাল্‌টে দেখলাম। তারপর মন এতই খারাপ হ'য়ে গেল—এখানে না এসে কিছুতেই থাক্‌তে পারলাম না।

শ্রদ্ধায় উত্তরার মনটা ভরিয়া উঠিল। কে বলে বাঙলা দেশে দরদী নাই? কে বলে দুঃখীর দুঃখ দেখিয়া মানুষের প্রাণ গলে না?

মনতোষ আরো বলিল—অথচ এতখানি পথ আস্‌তে আমাকে ভুগতে হয়েছে অনেকখানি। বেলেঘাটায় পথ ঘাট তো চিন্‌তাম না, ধরতে গেলে এই আমার প্রথম আসা, তার ওপর রাত্রিকাল! কিন্তু এতক্ষণ আপনাকে বিরক্ত করলাম, হয়তো এই অভদ্রতার একটুও মার্জ্জনা নেই। তবু আরো একটুখানি অভদ্রতা না দেখিয়ে আপনাকে রেহাই দিচ্ছি না,···যদি কিছু মনে না করেন...আপনার নামটা—

উত্তরা ঈষৎ হাসিয়া বলিল—আমার নাম শ্রীমতী উত্তরা দেবী।

মনতোষ বলিল—কথাটা কি জানেন? যদি কখনো আবার দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ ঘটে, কিংবা বিবাহ সম্বন্ধে কথা কইতে যদি আবার কোনদিন এখানে এসে পড়ি···আপনার নাম না জানার দরুণ আমাকে অতৃপ্তি ভোগ করতে হবে।

উত্তরাও কথা কহিবার ফাঁক খুঁজিতেছিল। এই সৌম্য প্রিয়দর্শন যুবার ভদ্রতা দেখিয়া বাস্তবিকই সে উত্তরোত্তর বিস্ময় অনুভব

করিতেছিল। একটা কথা মনে আসিতেই, জিজ্ঞাসা করিল—কিন্তু আপনার চাকরটির জুতো জোড়া তো দেখ্‌ছি না?

অপ্রতিভ হইয়া মনতোষ কহিল—দেখ্‌লেন?—সত্যি বলছি, এতক্ষণ একবারও মনে পড়েনি আমার। জুতো জোড়া সেই 'বাস' খানাইতেই প'ড়ে রইলো।

—"আচ্ছা ভোলা মন যা হোক্!" বলিয়াই উত্তরা লজ্জিত হইয়া পড়িল। যেন এতখানি বলিবার মত সাহস তাহার মোটেই ছিল না।

মনতোষ বলিল—মনের অবস্থা মন্দ হ'য়ে পড়লে মানুষের সব সময় সকল কথা মনে থাকে না উত্তরা দেবী! বিজ্ঞাপনটা দেখে, রঘুনন্দন মুখুয্যের কল্পিত মুখখানাই সর্ব্বদার জন্যে আমার মন ও চোখের সম্মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। শুন্‌লে হয় তো আরো আশ্চর্য্য হয়ে যাবেন—আমি যে জন্যে বাড়ী যাবো ব'লে হাট-বাজার করেছি,—না যাওয়াতে আমার কতখানি কর্ত্তব্য অবহেলা হ'য়েচে।

উত্তরা কৌতূহলী হইয়া কহিল—খুব দরকারী কাজ কর্ম্ম বাড়ীতে আছে বোধ হয়?

—হ্যাঁ, বিবাহ।

উত্তরার আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার সাহস আসিল না। কিন্তু কৌতূহল তার মনের কূলে কূলে ভরিয়া গেছে।

মনতোষ বলিল—বাড়ীতে এতক্ষণ রসোনচৌকীর শানাই বাজ্‌চে হয় তো।

হাসিয়া উত্তরা বলিল—এত রাত্রেও?...তারপরই বলিয়া বসিল—কিন্তু কার বিয়ে?—

মনতোষও হাসিয়া উঠিল। বলিল—ভারি এক মজার ব্যাপার উত্তরা দেবী,—যার বিয়ে, সেই-ই কিন্তু ভুলে রইলো।—সেই যে কথায় বলে না—যার বিয়ে তার মনে নেই—

উত্তরার কথা কহিবার সাহস কমিয়া আসিতেছিল। যে দুর্দ্দমনীয় পিয়াসা ও বুভুক্ষু দৃষ্টি ফেলিয়া এতক্ষণ সেই তরুণের পানে ঘন ঘন চাহিতেছিল, একথার পর আর একটা কথাও বলিবার বা জানিবার জন্য তাহার সাহসে কুলাইল না। কিন্তু তখনই আবার মনে পড়িয়া গেল—নিরঞ্জন বাবুর মুখখানা,—তাঁর অমায়িক আপন-করা ব্যবহার। —অন্তরের কাছে—অন্তর্যামী দেবতার কাছে তাহার অন্তরের ভাব অবশ্যই গোপন ছিল না। কিন্তু পিতার তুষ্টি সাধন জন্য সে যে অকাতরে অন্তরকে বঞ্চনার বাণীই শুনাইতে বসিয়াছে!—

মনতোষ কহিল—মুখুয্যে মশায় যেখানে গেছেন—আপনি ঠিকানা জানেন?

—ঠিক জানি না, তবে চরকডাঙ্গা রোড্…গোবিন্দবাবুর বাড়ী ব'ল্‌লে শুনেছি সেখানে যাওয়া যায়। কিন্তু এই দুপুর রাত্তিরে—সেখানে যাওয়া…

—অবশ্য ততটা সম্ভব নয়, কিন্তু বিপদে অসম্ভবও সম্ভব হ'য়ে দাঁড়ায়।—নইলে সমস্ত রাত্রিটা আপনি একা থাক্‌বেন?—আমিই বা এভাবে আর কতক্ষণ আপনাকে বিরক্ত করবো?

উত্তরা ভয়ানক কুণ্ঠিত হইয়া বলিয়া উঠিল—আমি তো সে-কথা আপনাকে বলিনি। আপনি না এলেই বরং এত রাত পর্য্যন্ত একলা থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হ'তো—

মনতোষ বলিল—আপনি তবে ঘণ্টাখানেক একা থাকুন, আমি তাঁর খোঁজ নিয়ে আসচি।

উত্তরা উদ্বিগ্ন চিত্তে বলিল—তবে কি আপনার মনে হচ্ছে—বাবার কোন বিপদ্ ঘটেচে ?

—না না, সে কথা মনে আন্‌ছেন কেন ?…আমি আপনার জন্যেই ব'লছিলাম।…মনে করুন—সমস্ত রাতটাই যখন আপনাকে বাড়ীতেই থাকতে হবে, তখন ব'সে বা আমার সঙ্গে গল্প ক'রে কাটালে তো চ'লবে না !

উত্তরা ঘাড় হেঁট করিয়া ভাবিতে লাগিল।

মনতোষের কথা একটুও মিথ্যা নয়। বাস্তবিকই দু'জনে বসিয়া সমস্ত রাত্রি গল্প করাও তাহার পক্ষে একান্ত অশোভন। বিশেষতঃ চির-অপরিচিত এক তরুণ আগন্তুকের সঙ্গে !

উত্তরা কাঁদ কাঁদ হইয়া কহিল—তবে কি হবে ?—আপনি আমাকে পরামর্শ দিন…

—পাড়ায় কোন পরিচিত লোক নেই ?

—আছে। কিন্তু একজন খোঁজ নিতে গেছে, এখনো ফিরলো না। এত রাত্রে আর কারুকে অনুরোধ করলে, যদি না শোনে !

মনতোষ কহিল—বরাতটা আপনার চেয়ে আমারই বেশী খারাপ। নইলে দেখুন না—যেখানে যাচ্ছি, সেইখানে গণ্ডগোল। আবার বাড়ীটা আমার নিজস্ব কি না, তাই সেখানে না গিয়েও গণ্ডগোল বাধালাম।

সমস্ত চিন্তার পুরোভাগে উত্তরার মনে যে কথা জানিবার দুর্দ্দমনীয় কৌতূহল জাগিল, তাহাকে সে কোন প্রকারেই আর দূরে ঠেলিয়া রাখিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল—সেখানে কার বিয়ে, কই ব'ললেন না তো ?

মনতোষ হাসিয়া ফেলিল। যেন ব্যাপারটা কিছুই নয়। কহিল—

আগেই তো ব'লেছি—বিয়ে যার তারই ভুল হ'য়ে গেছে।···বিয়ের দিনটা আমারই হ'য়েছিল উত্তরা দেবী!

—"কি সর্ব্বনাশ!...তবে গেলেন না কেন?" বলিতেই উত্তরার মুখখানা পাংশুবর্ণ ধারণ করিল।

মনতোষ জবাব দিল—টেলিগ্রাফ্ করে দিয়েছি।

—কি টেলিগ্রাফ্?—যাবেন না ব'লে?···

হাঁা, শরীর অসুখ,—বিয়ে হবে না।...

উত্তরা ব্যাপারটা বুঝিয়াই আবার দুশ্চিন্তিত হইল। এত বড় দায়িত্বকে যে হেলায় তুচ্ছ ভাবিতে পারে, সে কেমনতর লোক?··· যে-সে-ব্যাপার নয়—বিবাহ। কহিল—কাজটা কিন্তু বড়ই বিসদৃশ ঠেক্‌চে। ···বলিতে বলিতে তাহার লজ্জার মাত্রা এতই বাড়িয়া উঠিল যে, কোন মতেই আর মাথা তুলিয়া থাকিতে পারিল না। ছি ছি—এই মুহূর্ত্তের পরিচিত পথের পথিক না জানি তাহাকে কতই প্রগল্‌ভা ভাবিল!

মনতোষ বলিল—কিন্তু বর্ত্তমানে আমি যে অবস্থায় হঠাৎ প'ড়ে গেছি, তাতেও এমনি ধারা খবর না পাঠালে, আমার আর অন্য পন্থা ছিল না। তার জন্যেও আমি কিছু মাত্র চিন্তা করি না। যেখানে বিয়ে হচ্ছিল,—তারা জমিদার, টাকার অপ্রতুল নাই। এক দোর বন্ধ হ'লেও তাদের আরো পাঁচ দোর খোলা রয়েচে। তা ছাড়া, আমি তো যে-সে নই, মায়ের অঞ্চলের নিধি,···মা আমাকে অসুখী করেই কি সুখ পাবেন ভেবেচেন?...

উত্তরার ক্রমেই কৌতুহল বাড়িয়া চলিতেছিল।···এই সব অসংলগ্ন কথাকে একত্র গ্রথিত করিয়া বুঝিবার মত অনেক কিছু থাকিলেও, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সে-সময় সে পাইল না।

পেটা-ঘড়িটাতে একটা বাজিল।

মনতোষ কহিল—কি করা যায় বলুন তো?—আপনি কোনো রকমেই একলা থাকৃতে পারবেন না?—সাহস করে যদি পারতেন তা হ'লে বড় ভাল হ'ত।

উত্তরা কিছু না বলিতেই, দরজায় শব্দ হইল।

উত্তরা ব্যগ্রভাবে ডাকিয়া উঠিল—বাবা!

কিন্তু বাহির হইতে একজন বলিল—তাঁর ফিরে আস্‌তে দেরী নেই। আমায় ব'ললেন—তুমি যাও, আমি এক্ষুণি রওনা হবো।...নিধু পিসীকে নিয়ে এসেচি, ততক্ষণ তোমার কাছে থাকবে।...দোরটা খোলো।

উত্তরা দরজা খুলিয়া দিতেই, পাড়ার নিধু বুড়ী ভিতরে ঢুকিল, যে লোকটি কথা বলিতেছিল—সে ভিতরে না আসিয়া চলিয়া গেল।

মনতোষ বলিল—আপনার বাবার দেহ ভাল নয়, এসে, এই রাত দুপুরে কথাবার্ত্তা কওয়ারও সুবিধে হবে না তাঁর। আজকের মত আমি উঠ্‌চি। যদি দরকার বিবেচনা করেন, আমায় সংবাদ দিলে আস্‌বো।

—"কিন্তু'—বলিয়াই উত্তরা মাথা হেঁট করিল।

মনতোষ হাসিয়া বলিল—লজ্জা করবে ব'ল্‌তে?...আচ্ছা, আমি লিখে রেখে যাচ্ছি। বলিয়া পকেট হইতে কাগজ ও কলম বাহির করিয়া দু'তিন ছত্র লিখিয়া উত্তরার হাতে দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে মাদুর ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

কাগজখানা না দেখিয়াই ভাঁজ করিতে করিতে উত্তরা বিস্মিতভাবে কহিল—আপনি উঠলেন যে?

—কি করবো।—রাত যে শেষ হ'তে চ'ললো!

—তবে যে ব'ললেন—গেট বন্ধ হ'য়ে গেলে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হবে?

মনতোষ জোরে হাসিয়া উঠিল। কহিল—আচ্ছা পাগল যা হোক্!—আপনি সেই কথাই এতক্ষণ মনে করে রেখেচেন? আচ্ছা, আপনি কি মনে করেন—আমরা জেলখানায় থাকি? থিয়েটার বায়োস্কোপ দেখারও হুকুম নেই আমাদের? আপনি ভাববেন না,—গেট আমার খোলা না থাক্‌লেও, গেটের দারোয়ান মরে থাক্‌বে না। ডাক্‌লেই সে দরজা খুলবে।

উত্তরা কিছু বলিল না।

মনতোষ বলিল—আমি আসি তা'হলে। নমস্কার!

উত্তরা কহিল—এত রাত্রে...পায়ে হেঁটে···

—না না, আমি ট্যাক্সি করে যাবো।

—কালই বুঝি দেশে যেতে হবে?

—"নাঃ...দুচার দিন এখন আর যাচ্ছি না"—বলিয়া মনতোষ ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণে নামিয়া পড়িল।

উত্তরাও নামিল। বলিল—আর একটুখানি থাক্‌লেই বাবার সঙ্গে দেখা হ'ত।

—সে পরে হবে, আজ আর তাঁকে ব্যস্ত করা ঠিক নয়।...আচ্ছা...

সহসা উত্তরা ভাবপ্রবণতার জন্যই হোক্ আর যে জন্যই হোক, প্রাঙ্গণের উপরেই ভূমিষ্ঠ হইয়া মনতোষকে প্রণাম করিল।

মনতোষ বিস্মিত হইল যতখানি—তাহার চতুর্গুণ হইল পুলকাঞ্চিত!

মনতোষ চলিয়া গেলে, নিধু বুড়ী জিজ্ঞাসা করিল—বাবুটি কে মা?

উত্তরা সামান্যক্ষণ নীরব থাকিয়াই বলিল—আমাদের আপনার লোক পিসী!···খোজ খবর নিতে এসেছিল।

—"আহা বেঁচে থাক্ !...বেশ ছেলেটি।" বলিয়া নিধু পিসী বার বার হাই তুলিয়া আসন্ন নিদ্রার আরাধনায় ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

উত্তরা কহিল—পিসী, তোমার ঘুম পাচ্ছে বুঝি ?

—বুড়ো মানুষ, ঘুমের কি আর দোষ আছে মা ?...সারাটা দিন খেটে খেটে মরি, রাত দুপুরে যে একটু খানি নাক ডাকিয়ে ঘুমুবো, সে কপালও করে আসিনি।

উত্তরা বাস্তবিকই ব্যথিত হইল। মনতোষকে যে মাদুরখানি বসিতে দিয়াছিল, সেইখানির উপরেই ছোট একটা বালিস আনিয়া দিয়া কহিল—শুয়ে পড়ো পিসী।

—আর তুমি ?

—"বাবার জন্যে অপেক্ষা করবো—এতক্ষণ হয়তো অনেক দূরে চলে এসেছেন" বলিতে বলিতে উত্তরার আরও একটা কথা মনে হইল—মনতোষ বাবুও ট্যাক্সিতে চাপিয়া এতক্ষণ অনেক দূরে চলিয়া গেলেন। —ব্যবধানের ইহাই তো বিধান !—

শুইতে শুইতেই নিধু বুড়ীর নাসিকা গর্জ্জন শ্রুত হইল। কিন্তু উত্তরা কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ন্যায় স্থিরভাবে বসিয়া রহিল। বাহ্যদৃশ্যে সে কাষ্ঠ-পুত্তলিকা, কিন্তু তার অন্তরে বিবিধ ভাব-তরঙ্গের বিচিত্রতা সুরু হইয়া গেছে !

দরজায় পুনঃ পুনঃ আঘাত দিয়া পূর্ব্বের সেই যুবকটি, যে নিধু বুড়ীকে রাখিয়া গিয়াছিল, সে ডাক দিল—উত্তরা ! উত্তরা ! শীগ্‌গীর দোর খোলো—শীগ্‌গীর !

উত্তরা তাড়াতাড়ি উঠিতে গিয়াই, পায়ের আঘাতে আলোটা ফেলিয়া দিল। ক্ষুদ্র বাড়ীখানা হইল—বিকট অন্ধকারের রাজত্ব।

দরজা খুলিয়াই উত্তরা একটা অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল।—কে—কে—ও-কে?

যুবকটি কহিল—পরে শুনবে,—শীগ্‌গীর আলো নিয়ে এসো।

উত্তরা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—আলো নিভে গেছে।—আগে বলো—ও-কে?

—মুখুয্যে মশায়কে রাস্তায় গুণ্ডারা ধরেছিল।—কিন্তু শীগ্‌গীর আলোটা জ্বেলে আনো উত্তরা—ওঁর জ্ঞান নেই।

উত্তরা কাঁদিয়া উঠিল, কহিল—ওগো! তোমাদের পায়ে পড়ি,—বলো বাবা বেঁচে আছে তো?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ ভেব না। আলো জ্বালো শীগ্‌গীর!

—"আমি পারবো না গো!—তোমরা জ্বেলে নাও,—আমার যে আজ ত্রিভুবন অন্ধকার হ'য়ে গেছে! আলো কোথায় যে জ্বালবো?" বলিয়া রঘুনন্দনের সংজ্ঞাহীন দেহ আঁকড়িয়া উত্তরা সেখানেই বসিয়া পড়িল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অর্থহীন চির দরিদ্র যাহারা, এ সংসারে তাহাদের সাংঘাতিক পীড়ার সময় প্রথম হইতে শেষ চিকিৎসা করেন—স্বয়ং ভগবানই। মানুষের চিকিৎসার নাগাল পাওয়া সব সময় তাহাদের সামর্থ্যে কুলাইয়া উঠে না।

গভীর নিশীথে, পথের মাঝখানে আততায়ীর আক্রমণে পড়িয়া রঘুনন্দন ভীষণভাবে আহত হইয়াছেন বটে, কিন্তু এই জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে আসিয়াও তিনি স্বীয় জীবন রক্ষার জন্য কিছু মাত্র উপায় অবলম্বন করিতে পারেন নাই। কারণ—প্রবল অর্থাভাব! তা ছাড়া গুণ্ডার অত্যাচার—কোথায় কি ভাবে কেন হইয়াছে, তাহাও তাঁর বলিবার শক্তি নাই! বাকী রাতটুকুর মধ্যে একবারও তাঁর সংজ্ঞা ফিরিয়া আসে নাই।

প্রাতঃকাল হইতেই উত্তরা পিতার সারা দেহের প্রতি অপলক দৃষ্টি ফেলিয়া দেখিতে দেখিতে আপন অন্তর্নিহিত বেদনার ঘায়ে ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল!...জীর্ণ এ জীবনে, লক্ষ অত্যাচারের পরও কি তাহার পিতা নিষ্ঠুর এই আকস্মিক আঘাত সহ্য করিতে পারিবেন?...কিন্তু যদি কিছু হয়!—যদি বিনা চিকিৎসায় বিনা তদ্বিরেই আজ তার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্বল তাহাকে অকূল পাথারে ভাসাইয়া চিরতরে অন্তর্হিত হইয়া পড়ে—তবে—তবে—উত্তরার কি হইবে? কোথায় সে দাঁড়াইবে,—কি সে খাইবে—কেমন করিয়া সে বাঁচিবে?

কিন্তু কী নিষ্ঠুর সে!...আপন হীন স্বার্থের কথা ভাবিয়াই আকুল হইতেছে—অথচ মরণ-পথ-যাত্রী পিতা, অপঘাতে মৃত্যুর দুয়ারে অগ্রসর হইতে চলিয়াছেন, তবু সে চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা করিবে না!... কিন্তু কেমন করিয়া করিবে?...কে তাহার আছে?—ওগো! সর্ব্বদর্শী নিষ্ঠুর করুণাময়! ভাণ্ডার কি তোমার সত্য সত্যই আজ রিক্ত?... এককণা করুণাও কি আর অবশিষ্ট নাই? সৃষ্টি করিয়াছ, বাঁচাইবার ভার কি লও নাই ঠাকুর?

...গতরাত্রে পাড়ার যে যুবকটি রঘুনন্দনকে সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় বাড়ী পৌছাইয়া দিয়া গিয়াছিল, সে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কেমন আছেন?—জ্ঞান হ'য়েচে?

উত্তরা চোখের জল মুছিয়া বলিল—না।...

—একজন ডাক্তার ডাক্‌লে হ'ত...

উত্তরার বলিবার মত কিছুই ছিল না। ডাক্তার ডাকিবার জন্য সে তো সততই প্রস্তুত, কিন্তু এই কলিকাতা সহরে এমন দয়ালু চিকিৎসক কে আছেন, যিনি বিনা অর্থে তাহার পিতাকে রোগমুক্ত করিয়া দিবেন? সে তো তাঁহাকে জানে না।

কিন্তু উত্তরা বরাবরই বিশ্বাস করিত—যার কেউ নাই, তার স্বয়ং ভগবান আছেন। মানুষ মানুষকেও ভুলিতে পারে, কিন্তু বিশ্বস্রষ্টা—বিশ্ব-পালক হইয়া বিশ্বনাথ তো তাহা পারেন না!

...রঘুনন্দন চোখ মেলিয়া চাহিলেন।

উত্তরা পিতার মুখের কাছে মুখ আনিয়া ধীরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—বাবা! কেমন আছো বাবা?

—মা!...রঘুনন্দন কথা কহিতে কষ্ট বোধ করিতেছিলেন।...

উত্তরা চাহিয়া দেখিল—পিতার কোটরগত নয়ন অশ্রুময়! কহিল—কষ্ট হচ্ছে বাবা?—কিছু খাবে?

"মা!"—উত্তরা!...কষ্ট? বড় কষ্ট মা!...কিন্তু এ কাজ কে করলে মা!"—বলিয়া রঘুনন্দন কন্যার মুখপানে চাহিয়া উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

উত্তরা কাঁদিল না, সপ্তসিন্ধুর কল্লোলিত তুফান লইয়া অশ্রু তাহার নয়নে আসিতেছিল, কিন্তু পাছে তাহার নয়ন-নীরে রোগার্ত্ত পিতার ধৈর্য্য শিথিল হয়, এই আশঙ্কায়, সে যথাসম্ভব চেষ্টায় দৃঢ়তাকে আঁকড়িয়া রাখিবার চেষ্টা করিল।

রঘুনন্দন কহিলেন—শত্রু তো আমাদের কেউ নেই উত্তরা!—তবে এ শত্রুতা সাধলে কে? যাদের জল খাবার ভাঁড় নেই, ঘুমিয়ে থাকার মাদুর নেই, তাদের শত্রু কি করে গজালো?...

প্রতিবেশী যুবাটি অদূরে বসিয়া ছিল, সে কহিল—অপনাকে অত রাত্রে একা আস্তে হ'ত না।

রঘুনন্দন হঠাৎ কোমরে হাত দিয়া কি দেখিলেন—তারপর ঈষৎ চিন্তা করিয়া উত্তরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—টাকাগুলো তুলে রেখেছিস মা?

বিস্মিত হইয়া উত্তরা বলিল—টাকা! কিসের টাকা বাবা? কোথায় পেয়েছিলে?

রঘুনন্দন আপন মনে বলিলেন—এই অর্থেই আমার মহা অনর্থ হয়ে গেছে!...তারপর প্রকাশ্যে বলিলেন—গোবিন্দ বাবুর আসন্নকাল,—তিনি কন্যাদায়ের জন্য আমাকে পাঁচ শো টাকা দান করেছিলেন। সমস্ত টাকাটাই আমার সঙ্গে ছিল।...বুঝতে পারছি উত্তরা!—গরীবের কপালে কোন সুখই সয় না—কিন্তু যারা মেরে পালালো—তারা জানুক

কোথেকে? টাকার কথা তো আমি আর কারুর কাছে বলিনি!…রিক্সাওয়ালা…না সে-ও জান্‌তো না তো!

উপবিষ্ট প্রতিবেশী যুবক কহিল—বোধ হয় সেখানকার বাড়ী থেকেই গুণ্ডারা আপনার পেছু নিয়েছিল।

—"তা হবে,…পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'তে হবে তো!…এ জন্মের নয়—পূর্ব্ব জন্মের।" বলিয়া রঘুনন্দন পাশ ফিরিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু পারিলেন না।

যুবকটি আর কিছু না বলিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া গেল।

রঘুনন্দন ভাবিতে ভাবিতে একসময় বলিলেন—নিরঞ্জনকে একটা খবর দিস্ মা।…কি জানি দেহের কথা তো বলা যায় না।—যদি মরি—তোকে তার হাতে জীবিতকালেই সঁপে দিয়ে যাবো।…এক্ষুণি লিখে দিস্ মা!

উত্তরা কহিল—ঠিকানাটা তো জানা নেই বাবা! বলিয়াই আর একজনের ঠিকানার কাহিনীটা নিবিড়ভাবে তাহার বুকের মাঝে ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু বলিবার মত স্পর্দ্ধা পাইল না। মনতোষকে সে কোন রকমেই সাধারণ অতিথির পর্য্যায়ে ফেলিতে পারে নাই।

নিরঞ্জনের কথা উঠিতেই উত্তরা জিজ্ঞাসা করিল—নিরঞ্জন বাবু তোমাকে যে টাকাগুলো দিয়ে গেলেন বাবা, সেগুলো কোথায় রেখেচ?

রঘুনন্দন ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। বলিলেন—অদৃষ্টের নিতান্ত বিড়ম্বনা উত্তরা!…সে টাকাগুলোও আমি সঙ্গে করে নিয়ে গেছলাম।…কে জান্‌তো আজ আমাকে ধনে-প্রাণে মরতে হবে? কিন্তু টাকার কি তোর দরকার আছে মা? চাল-ডাল তো নিরঞ্জন অনেকগুলোই কিনে দিয়ে গেছে।

উত্তরা দাঁতে দাঁত চাপিয়া ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল, তারপর নিরাশকণ্ঠে কহিল—একজন ডাক্তার আনতাম।...উপায় নেই বাবা! আমি তোমার অক্ষম মেয়ে!—মেয়ে না হ'য়ে আমি যদি ছেলে হ'তাম, তোমাকে এখনো বিনা চিকিৎসায় ফেলে রাখি?...আমার মত অভাগিনী যে দুনিয়ায় আর কেউ নেই বাবা! ..এতখানি নিঃসম্বল আমি—

রঘুনন্দন ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিলেন—পাগ্‌লি মেয়ে কোথাকার! .. ডাক্তার এসে কি করবে? কী হয়েচে আমার? কিন্তু যার জোরে তোর জোর, তাকে একটা সংবাদ দে। সে এলে আমি যে নিশ্চিন্ত হই!

উত্তরা মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—কার কথা ব'লছো বাবা?

—কেন নিরঞ্জন, তোর স্বামী...

উত্তরা আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—বাবা! আমি এখনো মনের সঙ্গে তাঁকে স্বামী বলে মান্‌তে পারিনি। দিবারাত্রি মনের সঙ্গে লড়াই করেছি—তবু পারিনি। তুমি ও-কথা বলে আমাকে ছোট করে দিয়োনা বাবা।

রঘুনন্দন আত্মগত ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। সত্যই তো! যদি অন্তর না চায়, আজ অন্তিমের কবলিত হইয়া কেনই বা এ জুয়াচুরির অভিনয়! পিতা হইয়া প্রতারকের ব্যথা তিনি কেন দিবেন!

রঘুনন্দন কোন কথা কহিতে পারিলেন না। ধীরে ধীরে উত্তরার কোলের উপর আপন শীর্ণ হাতখানি পাতিয়া আরামে ঘুমাইবার চেষ্টা করিলেন।

উত্তরা চিন্তা করিতে লাগিল—এখন তাহার কর্ত্তব্য কি? পিতার ইচ্ছাক্রমে নিরঞ্জনকে পত্র লিখিয়া দিতে তাহার আপত্তি নাই কিন্তু

তার পরের কর্ত্তব্য সাধনে, অন্তরের গূঢ় অভ্যন্তর হইতে ঘোরতর আপত্তি উঠিতেছিল !...

রঘুনন্দনের তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল। চোখ মেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—চিঠিখানা লিখ্‌লি মা?...যা লিখে দে।...সে আসুক তো!...ঘাড়ে ঋণের বোঝা চাপিয়ে আমি শান্তিতে মরতে পারবো না উত্তরা!...আমি তার কাছে মার্জ্জনা চাইবো। তাকে জানাবো—সাধ্যের অতীত যা, তা আমি কেমন ক'রে দিই?...

উত্তরার অভিমান হইল। কিন্তু কি করিবে সে? বুক চিরিয়া রক্ত সে বাহির করিতে পারে কিন্তু সে রক্ত উৎসর্গ করিবার মত শক্তি হয়তো তার একটুও নাই। কিন্তু সে আর বসিয়া রহিল না, মনে মনে একটা সংকল্প আঁটিয়া, ধীর চিত্তে পত্র লিখিবার জন্য উঠিয়া গেল ...

...সন্ধ্যার সময় হঠাৎ রঘুনন্দনের প্রবল জ্বর আসিল। জ্বরের ঘোরে অনেক ভুল অসংলগ্ন কথাও তিনি বলিতে লাগিলেন।

উত্তরা নিরুপায় হইয়া শুধু কাঁদিতে লাগিল। প্রতিবেশী নিধুবুড়ীর মারফতে ঘরের যা কিছু কাপড় বা বাসন-কোসন অবশিষ্ট ছিল তাহার অধিকাংশই জলের দরে বিক্রয় করিয়া যাহা পাইল,—তাহার সংখ্যা মাত্র পাঁচ টাকা।

নিধুবুড়ীই ডাক্তার ডাকিয়া আনিল। চিকিৎসা যথারীতি সুরু হইল বটে, কিন্তু জ্বর কমিল না, বাড়িতে লাগিল; বিকার পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করিল।...

রাত্রি নির্জ্জন। খোলার বস্‌তির মধ্যে কাহারও বাড়ীতে কোন প্রকার সাড়া শব্দ নাই,—উত্তরা বিনিদ্রভাবে অতি উৎকণ্ঠিত চিত্তে পিতার রোগ-শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া আছে।...অদৃষ্টে যাহা লেখা আছে,

তাহা তো হইবেই, কিন্তু যদি আজ সত্য সত্যই বৃন্তচ্যুত ফুলের মতই ধরার বুকে ঝরিয়া পড়ে,—শুকাইয়া অকালেই কি তবে মৃত্যুকে বরণ করিতে হইবে?

উত্তরা কিছুতেই ঠিক করিতে পারিতেছিল না—নিরঞ্জন বাবুকে সে পত্র দ্বারা সকল কথা জানাইবে কি না। মন অবশ্য সায় দিতে পারিতেছে না, কিন্তু একটা কর্ত্তব্য থাকিয়া থাকিয়া বুকের মধ্যে খোঁচা দিতেছিল।...উত্তরার নিজের দিক্ দিয়া আশা করিবার কিছু থাক্ বা না থাক্, নিরঞ্জনের আশার সৌধ সে কি আজ সত্য সত্যই চূর্ণ করিয়া দিবে? কিন্তু কেনই বা দিবে না? আশার সৌধ নিরঞ্জনের হইলেও, তাহার পক্ষে সে তো নিরাশারই পাষাণ স্তুপ!

সহসা রঘুনন্দন যন্ত্রণা-কাতরকণ্ঠে ডাকিলেন—মা!

উত্তরা পিতার বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল—বাবা!···খুব কষ্ট হচ্ছে?

হ্যাঁ মা!—বড় কষ্ট! উঃ···উত্তরা! মা আমার!...যদি না বাঁচি... কি হবে? তোর কি হবে মা?···ওরে, এই জ্বালাময় জীবন—এ তো গেলেই আমি বাঁচি!...কিন্তু তোর মুখখানা...আমার শান্তি সেই মা শান্তি নেই! মরা তো হবে না আমার!···নিরঞ্জনকে পত্র লিখে দিয়েছিস মা!···লিখেছিস?

উত্তরা পিতার জীর্ণ বুকের উপর মাথা রাখিয়া নীরবে ফুঁপাইতে লাগিল।

রঘুনন্দন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—লিখিস নি' মা?

—না বাবা!

একটা প্রবল স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস মোচনান্তে রঘুনন্দন কহিলেন—

বেশ করেছিস মা!...হয় তো জীবনের পরেও আমাকে অভিশাপের জ্বালাতে জ্ব'লে মরতে হ'তো।...

উত্তরা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—কার অভিশাপ বাবা! কেন?

রঘুনন্দনের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসিতেছিল। কহিলেন—বড় পিপাসা উত্তরা! জল দে!

জলপান করিয়া বলিতে লাগিলেন—হ্যাঁ কি ব'লছিলি মা? কার অভিশাপ—কেন?—অভিশাপ আমার কন্যার!...তোরই মা।

আর্ত্তকণ্ঠে উত্তরা বলিয়া উঠিল—বাবা! বাবা! নিষ্ঠুর হ'য়োনা আজ!...আমার আর কে আছে বাবা?...তুমি যদি অমন কথা ব'লবে—

রঘুনন্দন বলিলেন—মুখের কথা নয় মা! মুখের কথার কি দাম আছে উত্তরা?...অন্তরের কথা—সারা অন্তরের কামনা...দাম তারই।...নিরঞ্জনকে আমিও তো জানি মা!...তবু—উপায় না পেয়ে...কি করবো মা!...কিন্তু অশান্তির বিনিময়ে শান্তি আমি এ সময়ে আর চাই না উত্তরা!...তোর মনের সত্যই জয়ী হোক্।...জল...বড় পিপাসা! ...ওরে—সপ্ত সমুদ্রের জলেও আজ আমার পিপাসা মিট্‌বে না!...ভগবানের বিচারে এই অকৃতি অক্ষমের কি সাজা হবে জানি না, কিন্তু আজ আমার নিজের বিচার বুদ্ধিতে মনে হচ্ছে কি জানিস মা?—নিত্য নতুন লোকের সাম্‌নে তোর উপর যে অবিচার করে এসেচি,—তার সাজা—স্বহস্তে আপনার টুঁটি টিপে ধরা!...মা আমার!...দুঃখিনী কন্যা আমার!...আজ মৃত্যু যদি হয়, সুখের ব'লতে হবে।—কিন্তু—

—বাবা! বাবা! আর অমন কথা ব'লো না বাবা! একবার তোমার উত্তরার মুখপানে চেয়ে দেখ বাবা! ত্রিসংসারে কি তার আছে আর? কার মুখ চেয়ে...

—ওরে হতভাগী! ওরে সর্ব্বনাশী!...তাই তো আমি ব'ল্‌চি।... মরবার সুখটুকু আজ তোর মুখের দিকে চেয়েই দুঃখের মাঝে মিশে যাচ্ছে যে! যখনই ভাবচি—উত্তরা রে, আমি চ'ল্‌লাম তুই একলা একলা খালি চোখের জল ফেলতেই প'ড়ে রইলি, যখনই ভাবচি—আমার অবর্ত্তমানে বাঘ ভাল্লুক দূরের কথা, মানুষ এসেই তোর কচি মুণ্ডটা চিবিয়ে খাবে, তখন কি মনে হচ্ছে জানিস মা!...মনে হচ্ছে আমার একশো বছর পরমায়ু হোক্‌,—আমি যেন আমার উত্তরা মাকে ভাল ঘর-বরে দিয়ে মরতে পারি।...বেশী কিছু তো আশা নেই আমার,—খালি সুপাত্র।...বনে গিয়েও সুখ হয় মা! সুপাত্রে কন্যা পড়লে, বনে বাস করেও বাপের মনে সুখ থাকে। দুঃখের ভাত সুখে খাওয়াই তো সংসারীর সব চেয়ে বেশী বাহাদুরী! ...কিন্তু নিরঞ্জন যে কোনো রকমেই হোক্‌—আমাদের কাছে ভরসা পেয়ে গেছে।...আশার মোহে অনেকগুলো টাকাও জলের মত ব্যয় করেছে,...তার দোষ সে বুড়ো।...সংসার ভুলে' যখন হরিনাম করবার সময় এসেচে, তখন সে চায় বিবাহ করতে।

উত্তরা নত মস্তকে ধীর কণ্ঠে কহিল—তুমি যদি অনুমতি করো বাবা! আমি তোমার ভরসাদানের অমর্য্যাদা করবো না!...তুমি ভাল হ'য়ে ওঠো বাবা!...আমি তাই করবো।...এক্ষুণি সেখানে চিঠি লিখে দিচ্ছি।

—না না না!—আমার অনুমতি দেওয়ার শক্তি নেই উত্তরা।... মমতার ঘরে বাড়বানল জ্বাল্‌বার দুর্ভাগ্যকে যখন এড়িয়ে এসেচি, তখন আর তো আমি পাপের বোঝা বাড়াতে পারবো না মা।

মনতোষের কথা আনুপূর্ব্বিক পিতাকে জানাইবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াই উত্তরা কহিল—কাল সন্ধ্যার পর অনেকখানি রাত্রে, মেডিকেল

কলেজের একটি ভদ্রলোক এসেছিলেন বাবা! তাঁর ঠিকানাটাও দিয়ে গেছেন।

উত্তর দিতে গিয়াই রঘুনন্দন উচ্চ চীৎকার করিয়া উঠিলেন—পা দুটো জ্বলে গেল মা!—পুড়ে গেল! মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল উত্তরা!—ওরে, আর বুঝি রক্ষা নাই আমার!···ভগবান! তবে সত্যি-সত্যিই উত্তরার কাছ থেকে আমায় না নিয়ে ছাড়লে না ঠাকুর! কিন্তু কি ব'লছিলি? কে এসেছিল? ভদ্রলোক একজন?...কেন?

—সেই যে তুমি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলে—

সহসা রঘুনন্দন একটা অস্বাভাবিক চীৎকার করিয়া উঠিলেন। উত্তরা ভীত হইয়া কহিল—অমন করছো কেন বাবা? আমার কিন্তু ভয় করছে।

···কাগজের বিজ্ঞাপন!...এখানেও সেই নিরঞ্জনের অনুগ্রহভোগ!··· নাঃ আর বলিস্‌নি উত্তরা!···যাকে অবজ্ঞা করবো—তার উপকারের কথাও আর স্মরণ করবো না আজ!···নইলে আবার হয়তো মত বদ্‌লে যাবে। আবার হয়তো কর্ত্তব্য পালন করতে গিয়ে কর্ত্তব্যকেই অবহেলা করবো।···তুই থাম্‌ উত্তরা!...শান্তি যখন এলোই না,—তখন অশান্তিকেও আমি সহজে মান্য দেখাতে চাইবো না।···

উত্তরা ভাবিতেছিল—পিতার মতই সে কি এইরূপে শয্যাশায়ী হইতে পারে না?—দু'জনের সমান অবস্থা—সমান চিন্তা,···হয় না কি?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দুই দিন পরে…

মাতার নিকট হইতে জরুরী পত্র আসিয়াছে। মনতোষ একলা ঘরে, আপন 'সিটে' বসিয়া তাহা পাঠ করিতেছিল :—

বাবা মনু!

হঠাৎ বিবাহের দিন পিছাইয়া দেওয়াতে আমি রাধানগরের জমিদার কমলাকান্ত বাবুর কাছে বড়ই লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছি। তুমি তো জানই, আমাদের অপেক্ষাও কমলাকান্ত বাবুর জমিদারীর আয় অনেক বেশী। তাঁহার একটি মাত্র কন্যার সহিত তোমার বিবাহ স্থির করিয়া আমি আশা করিয়াছি—ভবিষ্যতে আমাদের জমিদারীর আয় আর রাধানগরের জমিদারীর আয় এক হইলে, তুমি একজন রাজার মতই সম্পত্তিশালী হইবে। অবশ্য কমলাকান্ত বাবুর কন্যা তেমন সুন্দরী নয়, তথাপি বহু সুপাত্র তাঁহাদের হাতে রহিয়াছে,…সম্পত্তির লোভ যেমন-তেমন লোভ নয়।

যদি তোমার এই বিবাহে অনিচ্ছা থাকে, তাহাও স্পষ্ট করিয়া বলা প্রয়োজন। কেন-না, দিন স্থির হইয়া, এমন কি আত্মীয়-কুটুম্ব-বাড়ীতে নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাইয়াও বিবাহ বন্ধ করা বড় কম লজ্জা বা দুঃখ ও আপশোষের কারণ নহে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল,—আমার মনু,—

কথনো মাতৃ-আজ্ঞা অবহেলা করিবে না। কিন্তু তাই বলিয়া ভুল বুঝিয়ো না—তোমার মা পুত্রকে অসুখী করিতে চাহিবে না।

...বর্ত্তমান মাসের ২৮শে তারিখে আর একটি ভাল দিন আছে, আমি ইচ্ছা করিতেছি, ঐ দিনেই শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন করিব। অতএব মায়ের একান্ত অনুরোধ, আমার পত্র প্রাপ্তিমাত্র বাটী রওনা হইবে।

মা, পুত্রের আসা-পথ চাহিয়া বাঁচিয়া রহিল। এখন পুত্রের কর্ত্তব্য পুত্রের কাছে। আমার স্নেহাশীষ লইয়ো। ইতি—তোমার মা।...

পত্র পাঠান্তে কিছুক্ষণ মনতোষ গম্ভীরভাবে চিন্তা করিতে বসিল।... কি করা যায়!

কিন্তু সমস্ত চিন্তা, কার্য্য ও কর্ত্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে—ষোড়শী উত্তরার কমনীয় মুখচ্ছবি ভাসিয়া বেড়াইতেছিল...

মনতোষ ভাবিতেছিল—তুচ্ছ রাধানগরের সম্পত্তি—তুচ্ছ রাজা হওয়ার দুর্দ্দমনীয় প্রলোভন।...জীবনের সুখ-শান্তি কি শুধু অর্থ হইতেই পাওয়া যায়? অর্থের বিনিময়ে মানুষ কি অদৃষ্টকেও ইচ্ছামত ভাঙিতে গড়িতে পারে? সহস্র সাধ-আশা-কামনাময় জীবনে অর্থই কি সর্ব্ব-শক্তিশালী?

কিন্তু মাতাকে বুঝাইতে হইবে, তাঁহার পায়ে মুখ গুঁজিয়া অভিমানের কান্না কাঁদিয়া মানসিক অবস্থার কথা বলিতে হইবে।

মনতোষ আপাততঃ বাটী যাওয়াই স্থির করিল। সে স্থির বুঝিতে পারিয়াছিল—পত্র দ্বারা সকল কথা লিখিয়া পাঠাইলে মাতার মনস্তুষ্টি হইবে না। কেন-না—মাকে সে বিলক্ষণ চিনিত, অত্যন্ত সরল-হৃদয়া সহস্র সদ্‌গুণসম্পন্না হইলেও পুত্র-স্নেহে তিনি ছিলেন একেবারে অন্ধের মতই। একবার সাক্ষাতে সকল কথা জানাইয়া মার্জ্জনা চাহিলে,

সে মার্জ্জনা ধারায় ধারায় মাতৃ-বক্ষ হইতে তাহার শিরে আশীর্ব্বাদের মতই বর্ষিত হইবে।...

...কিন্তু তখনই চিন্তা হইল—যদি ইহারই ফাঁকে একদিন রঘুনন্দন মুখুয্যে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া ফিরিয়া যান! হয়তো বা দেখা হইলে দিন স্থির হইতেও বিলম্ব হইবে না।...অথবা ইহার মধ্যে আর কোন যুবককেই যদি তিনি উত্তরা-রত্ন দান করিয়া ফেলেন!...সে তো সামান্য কথায় একটা যেমন-তেমন ভরসাও দিয়া আসিবার সুযোগ পায় নাই। সেদিন খালি দেবী প্রতিমার রূপলাবণ্য দেখিয়াই প্রাণ উৎসর্গ করিয়া আসিয়াছে। প্রাণ-দেউলে ঘটা করিয়া দেবী-প্রতিষ্ঠার উৎসব যে এখনো সম্পূর্ণই বাকী!

ভাবিয়া চিন্তিয়া মনতোষ রঘুনন্দনের উদ্দেশে একখানা চিঠি লিখিয়া ডাকে পাঠাইয়া দিল।

—"আপনার সহিত সাক্ষাতে বঞ্চিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। অদ্য হইতে ঠিক চার দিন পরে পুনরায় শ্রীচরণ দর্শন করিব। প্রণাম জানিবেন।"

'শ্রীচরণ দর্শন করিব'—আর 'প্রণাম জানিবেন' এই কথা লিখিয়া মনতোষ বড়ই আত্মতৃপ্তি লাভ করিল। উত্তরার পিতা—তিনি যে বাস্তবিকই তার পরম পূজনীয়।

...অপরাহ্ণ ছ'টার সময় মনতোষ দেশে রওনা হইয়া গেল,—ডাক-পিয়োন তাহার নামের একখানি পত্র আনিয়া যখন মালিকের খোঁজ পাইল না তখন পাশের ঘরেই যথারীতি বিলি করিয়া গেল।—ছাত্রদের কাহারও কাহারও কথামত, পিয়োন তাহাদের বন্ধু-বান্ধবের ঘরেও চিঠি পত্র দিয়া যাইত।

পত্রখানিতে কলিকাতারই এক ডাকঘরের ছাপ দেখিয়া অপর ছাত্রেরা যুক্তি করিয়া সেখানি মনতোষের দেশের ঠিকানায় পাঠাইয়া দিল।...

* * * ও-দিকে সমস্ত রাত্রি ট্রেণে কাটাইয়া প্রাতঃকালে মনতোষ ষ্টেশনে নামিল, গরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া নিজগ্রামে রওনা হইল। কিছু পথ যাইতেই সে দেখিতে পাইল—তাহাদের ঘরের পাল্কী ষ্টেশনে আসিতেছে। বেহারার দল তাহাকে দেখিয়াই অপরাধীর ন্যায় বলিল—পৌঁছুতে সামান্য দেরী হ'য়ে গেল, বাবু, আমাদের কসুর হ'য়েচে।

মনতোষ বুঝিতে পারিল—সন্তান-স্নেহ-পিয়াসী মা পত্র দিয়াই স্থির থাকিতে পারেন নাই, পুত্র যে পত্র পাঠ নিশ্চয়ই আসিবে, তাহা অন্তরে অন্তরে জানিতে পারিয়াই, ষ্টেশনে নামিয়া পাছে পুত্রের অসুবিধা হয় এজন্য পাল্কী পর্য্যন্ত পাঠাইয়া দিয়াছেন।

মাতৃ-গর্ব্ব অনুভব করিয়া মনতোষ অতিশয় তৃপ্তি পাইতেছিল। গাড়োয়ানকে পুরা টাকাই মিটাইয়া দিয়া, সে পাল্কীতে আরোহণ করিল।

কিয়ৎদূর অগ্রসর হওয়ার পর, মনতোষ ভাবিল—উত্তরাকে একটা সংবাদ দিয়া আসা তার উচিত ছিল।...তাহার পিতাকে যদিও পত্র দিয়াছে, তাহাতে তো দেশে আসার কথা লিখিয়া দেয় নাই। তাছাড়া উত্তরার সহিত তাহার আলাপ হইতেও বাকি নাই যখন, তখন দেখা না করিয়া আসা কর্ত্তব্যচ্যুতি ছাড়া অন্য কিছুই নহে।

...কিন্তু কেনই বা সে দেখা করিবে? দেখা করিবার মত সৌভাগ্য যদি তার ভাগ্যে না থাকে, তাহা হইলে অনর্থক মন খারাপে ক্ষতি ভিন্ন একটুও লাভ নাই।

মনের এই ঘাতপ্রতিঘাতের সঙ্গে সঙ্গে মনতোষের ইচ্ছা হইতেছিল—

—দূর হউক আবার কলিকাতায় ফিরিয়া যাই, উত্তরার মুখখানায় যে কত মধুরতাই মাখানো আছে!

...বাটী আসিয়া মাতাকে প্রণাম করিয়া, মনতোষ যখন নিজের ঘরে ঢুকিল তখন অপরাহ্নের ম্লান সূর্য্যাভায় সদ্যফোটা সন্ধ্যামণির শোভা ফুটিতেছিল।

...রাত্রে আহারের সময় মনতোষ মায়ের কাছে অকপটে সকল কথাই খুলিয়া বলিল। সংসারে একান্ত আপনার বলিতে এক 'মা' ছাড়া আর বন্ধু ছাড়া তার অন্য কেহই ছিল না। সেই মাকে সে লজ্জা করিয়া কোন কথা গোপন করিতে শেখে নাই।

সমস্ত বিবরণ পুত্রের মুখে অবগত হইয়া, পুত্রবৎসলা জননীর, পুত্রের মতের বিরুদ্ধে একটী কথাও আর বলিবার রহিল না। বিশেষতঃ উত্তরার দারিদ্র্য ও রঘুনন্দনের সর্ব্ববিষয়ে অক্ষমতার পরিচয় পাইয়া, তিনি পুত্রকে ভবিষ্যতে রাজা করিবার আশাও অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলিলেন।

মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন—হাঁরে মেয়েটিকে ভাল করে দেখেছিলি তো?

পুত্র কহিল—দেখেছিলাম বলেই আমি তোমার আদেশ অমান্য করতে তোমারই কাছে অনুমতি চাই মা!

—খুব সুন্দরী? রং খুব ফুট্‌ফুটে? মুখ-চোখ?

—দুঃখের প্রতিমা সে, দেহের লাবণ্য তার দুঃখের আবরণে একটুও ম্লান হয়ে যায় নি।...গরীবের যে কত ব্যথা মা! তুমি ধনী হ'য়ে তা বুঝবে না।

মাতা নীরবে অশ্রু মুছিলেন।...

পরদিন সকাল বেলায় মনতোষ সারা গ্রামখানা ঘুরিয়া ঘুরিয়া

ক্লান্ত পদে বাটী প্রত্যাগমন করিয়াই যে পত্রখানি পাইল, তাহা কলিকাতা হইতে প্রেরিত।

তাড়াতাড়ি খামখানা ছিঁড়িয়া পাঠ করিল—

নমস্কারান্তে নিবেদন—

আমার পিতৃদেব আকস্মিক আহত হইয়া মরণাপন্ন। আপনার আগমনের কথা তাঁহাকে বলিয়াছিলাম। তিনি সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। ইতি—

উত্তরা

পত্র পাঠান্তে মনতোষ অতিশয় অস্থির হইয়া পড়িল। মরণাপন্ন!... তবে কি উত্তরা আজ কলিকাতা সহরের সেই জীর্ণ কুটীরে একান্ত অসহায়া! আর সে বিশাল জমিদারীর একমাত্র মালিক,—গগন-চুম্বী সৌধের একাধিপতি! যাহাকে হৃদয়ের যা কিছু উৎসর্গ করিয়াও আরো দিবার সাধ হয়, সে আজ পাওয়ার অভাবে কাঙালিনী!...কে জানে কে চিকিৎসা করিতেছে,—গরীবকে কে অর্থ দিতেছে!...অথচ সে আজ বাদে কাল ডিপ্লোমাধারী বড় ডাক্তার হইবে!

মাতাকে পত্র দেখাইয়া মনতোষ কহিল—অনুমতি কর মা!—এখন-আমার কর্ত্তব্য কি?...অন্য কিছু নয়, শুধু একজন অনাথা নারীর জন্য অথবা দুস্থ বৃদ্ধের জন্যই বা আমার এখন কি করা কর্ত্তব্য?

মাতা একটুও চিন্তা না করিয়া বলিলেন—এই আটটার গাড়ীতেই তুই যাত্রা কর মনু!...আহা!—হতভাগী মেয়েটা বোধ হয় তোর ভরসাই একমাত্র সম্বল ভেবেচে। নইলে একরাত্রের এক ঘণ্টার আলাপে এমন নির্ভরতার সঙ্গে কেউ চিঠি লিখিতে পারে?

পিতা-পুত্রী।

উত্তরা পিতাকে স্নানের জন্য তাড়া দিতেছিল!

মনতোষ বিপরীত দিকে মুখ করিয়া বসিল। পাছে উদ্গত অশ্রু মাতার চক্ষে পড়ে এবং দুর্ব্বলতা ধরা পড়িয়া যায়!...

যাত্রার সময় মাতা, পুত্রের হস্তে এক তাড়া নোট দিয়া কহিলেন—বিপদের সময় বন্ধু বা আত্মীয় হ'তে হ'লে টাকা-পয়সারও দরকার হয় মনু!...হাজার টাকা সঙ্গে দিচ্ছি। চিকিৎসার জন্যে যদি আরো দরকার হয়, খবর দিস্, সঙ্গে সঙ্গে পাঠাবো।...কিন্তু ভাল-মন্দ যা হয় একটা কিছু হবেই, মেয়েটাকে আমার সেখানে আর ফেলে রাখিস্ নি বাছা... তাকে আমার ঘরেই আন্‌তে চাই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রাত্রি আটটা বাজিয়া গেছে।

বন্ধ দরজায় আঘাতের পর আঘাত দিয়া মনতোষ ডাকিতেছিল—উত্তরা! উত্তরা!

কিন্তু কোন সাড়া নাই! উঠানে একটা কেরোসিনের আলো মিটিমিটি জ্বলিতেছে। ঘরের ভিতরে লোক আছে কি না বাহির হইতে বুঝিবার উপায় নাই।

মনতোষ আবার ডাক দিল—উত্তরা! উত্তরা!

কিন্তু এবারেও যখন সাড়া পাওয়া গেল না, তখন মনতোষ জোরে ধাক্কা দিয়া জীর্ণ কপাট ভাঙিয়া ফেলিল।

দম্‌কা হাওয়ায় আলোটাও হঠাৎ নিভিয়া গেল!...ঘোর অন্ধকার। জনমানবের সাড়া শব্দ নাই।

আঁধারে দাঁড়াইয়া কি যে করিবে—মনতোষ তাহা ভাবিয়া পাইল না। উঠানে দাঁড়াইয়া পুনরায় ডাকিল—উত্তরা!

তথাপি সাড়া মিলিল না।

দরজা বাহির হইতে ভেজাইয়া দিয়া মনতোষ বাটীর বাহিরে আসিল এবং নিকটস্থ দোকান হইতে দেশলাই ও মোমবাতি কিনিয়া আবার ফিরিয়া আসিল।

...কিন্তু স্নিগ্ধ বর্ত্তিকালোকে পরিচ্ছন্ন ক্ষুদ্র গৃহতলে একি কঠোর দৃশ্য!

সর্ব্বাঙ্গ, অর্দ্ধমলিন ছিন্ন একখানি লালপাড় শাড়িতে আবৃত এক বৃদ্ধের দেহ!—মুখের কাছে মুখ রাখিয়া সংজ্ঞাহারা সংসার-তাপ-দগ্ধা শোকার্ত্তা তরুণী—সুন্দরী—উত্তরা!...যেন অগ্নির লেলিহান্ শিখার পাশে প্রফুল্ল শতদল!...রাহুকবলিত চন্দ্রের পদতলে দলিতা চকোরী!...ছিন্ন মর্ম্মবীণার চারিপাশে সুরহারা ঝঙ্কার!

উত্তরার মাথায় হাত দিয়া মনতোষ ধীরে ধীরে ডাকিল—উত্তরা!... তারপর বৃদ্ধের দেহ স্পর্শ করিয়াই চমকিয়া উঠিল!...প্রাণহীন!

—উত্তরা!

উত্তরা ধীরে ধীরে মাথা তুলিল। চোখ মেলিয়া চাহিল।—শুষ্ক উদাস —অর্থহীন সে চাহনি!

—উত্তরা!...

উত্তরা মনতোষের মুখপানে নির্নিমেষে চাহিয়া চাহিয়া তাহাকে দেখিতে লাগিল। মনতোষ সে দৃষ্টি দেখিয়া ভীত হইল!...মস্তিষ্ক বিকৃত নহে তো!

কিন্তু উত্তরা কথা কহিল,—এত দেরী হ'ল যে?—বলিয়াই ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল—বাবা! বাবা! একবার চাও বাবা! একটিবার চোখ মেলে চাও, দেখ কে এসেচে!...যার জন্যে মরণেও তুমি শান্তি পেলে না বাবা! চেয়ে দেখ একটিবার—সে তোমার পাশে ব'সে রয়েচে!—বলিতে বলিতে মৃত পিতার বক্ষে মুখ গুঁজিল।

মনতোষ উত্তরাকে সযত্নে উঠাইয়া, আপন পাশটিতে বসাইয়া নিবিড় স্নেহে তাহার মাথায় হাত রাখিল। জিজ্ঞাসা করিল—কতক্ষণ হ'ল?...

উত্তরা ধরা-গলায় জবাব দিল—বিকেলে—পাঁচটার সময়!

মনতোষ বিস্মিতভাবে চাহিল।...উঃ এই দীর্ঘ সময় মৃত পিতার

বক্ষে মুখ লুকাইয়া কী অমানুষিক কষ্টই না উত্তরাকে ভোগ করিতে হইয়াছে! কহিল—পাড়ার কেউ আসে নি?

—কেউ তো আস্‌বার নেই। আগে আগে যারা এসেছিল, তারাই বাবাকে আমার হত্যা করেছে।

কথা না কহিয়া মনতোষ জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিয়া রহিল।

উত্তরা বলিতে লাগিল—সে দিন রাত্রে যারা গোবিন্দ বাবুর ওখানে বাবাকে খুঁজ্‌তে গেছলো,—টাকার লোভে তারাই যুক্তি করে বাবাকে আমার মেরে ধরে টাকা কেড়ে নিয়েছিল।

—কিসের টাকা?

—বাবা যাঁকে দেখতে গেছলেন, তিনি বাবাকে পাঁচ শো টাকা দিয়েছিলেন, সেই টাকাই।

— কিন্তু এসব কথা ওরা জান্‌লে কেমন করে?

—ছ'জনের মধ্যে ভাগ নিয়ে গণ্ডগোল বাধে, একজন অন্যকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেলে, সে আমার কাছে এসে প্রকাশ করেছে। বল্‌লে—পুলিশে খবর দাও, দোষীর সাজা হোক্।

—তারপর?

—আমি তাতে রাজী হইনি।—আমার মত দোষী কি কেউ আছে? ...নিজে দোষী, অন্য দোষীকে কোন্ সাহসে আজ সাজা দেব আমি? ...কিন্তু আপনি এতই দেরী ক'রে এলেন! বাবা আমার শেষের কয়েক ঘণ্টা কেবলই আপনার নাম ক'রেছিলেন। আপনার চিঠিখানা যখন প'ড়ে শুনালাম, 'প্রণাম জানিবেন' কথাটা শুনে তিনি উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বলে উঠলেন—'এ যে জন্মজন্মকার পরমাত্মীয় উত্তরা! নইলে— এতখানি অধিকার চাইতে পারে?'

মনতোষ উত্তরার নিকট সকল কথাই খুলিয়া বলিল।

উত্তরা শুনিতে শুনিতে পিতৃ-শোকের দুঃসহ আঘাতের মধ্যেও যেন কথঞ্চিৎ আশ্বাস পাইবার আশা করিতেছিল।

অবশেষে মনতোষ যখন তার মায়ের ইচ্ছা জানাইল—'মেয়েটাকে তুই আমার কাছে এনে দিস্ মনু!' তখন আর উত্তরা নীরবে বসিয়া থাকিতে পারিল না। আপন অজ্ঞাতেই তাহার দুটি হস্ত অপরিচিতা মাতার উদ্দেশে যুক্ত হইয়া গেল।

মনতোষ ঘড়ি দেখিয়া কহিল—ন'টা তো বেজে গেল! কিন্তু আর মায়া বাড়িয়ে ফল কি উত্তরা? সৎকারের আয়োজন করি?

—কেমন করে করবেন?...এখান থেকে গঙ্গার ঘাট—কম দূর তো নয়। আমরা লোক পাবো কোথা?

মনতোষ একটুও চিন্তা না করিয়া বলিল—লোক আমি পঞ্চাশ জন যোগাড় করে আন্‌তে পারি···কিন্তু একটা কথার জবাব দাও দেখি—কোনো ডাক্তার দেখেছিল?···মারামারির কথা শুনে কিছু বলে নি?

—না, তিনি জ্বরের চিকিৎসা করছিলেন।

—যাক্, সার্টিফিকেট সম্বন্ধে যা হয় ক'রবো। কিন্তু আরো কথা আছে, যতক্ষণ আমি না ফিরি, তোমাকে একা থাক্‌তে হবে।

উত্তরা বলিল—কপাল আমার বড়ই মন্দ। আর কি আপনি ফিরে আস্‌বেন? যদি···

সহসা খপ্ করিয়া উত্তরার বাঁ হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া মনতোষ বলিল—উত্তরা! এখনো তুমি আমাকে 'পর' ভাবচো?···কিন্তু দাঁড়াও, তোমার সকল সন্দেহ ভঞ্জন করে দিচ্ছি...বলিতে বলিতে মৃতদেহের পদপ্রান্তে বসিয়া কহিল—এখানে বসো উত্তরা! ঠিক আমার পাশে!

যন্ত্রচালিতের মতই উত্তরা পিতার পদপ্রান্তে আসিয়া বসিল।

মনতোষ আপন দুটি হাতের মুঠায় উত্তরার দুটি হাত ধরিয়া মৃতদেহের পদনিম্নে স্থাপন করতঃ অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া কহিল—শপথ করলাম উত্তরা! তোমায় ছেড়ে আর কোথাও পালাব না! সংসারের পথে চ'ল্‌তে সম্পদে-বিপদে, আচারে-নিয়মে, ধর্ম্মে, তুমি হবে আমার চিরসাথী।… শপথ করলাম।…তারপর আর কিছু না বলিতেই উত্তরা বলিল—এই শপথ আমিও করছি।

শোকাশ্রু ও আনন্দাশ্রুর সংমিশ্রণে, নয়নে-নয়নে গঙ্গা-যমুনার মিলন হইতেছিল।

মনতোষ আলোর সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া, তাড়াতাড়ি পথে বাহির হইল এবং শীঘ্রই ট্যাক্সিযোগে হোষ্টেলে গিয়া মৃতদেহ-সৎকারার্থ লোকজন সংগ্রহ করিতে লাগিল।…

…এদিকে উত্তরা ছিল—পিতার শবদেহের পাশে একাকিনী বসিয়া। সদর দরজা খোলা ছিল, বন্ধ করিবার কথা তাহার মনে পড়ে নাই।

…দরজা ঠেলিয়া যে ব্যক্তি বাটীতে ঢুকিলেন—তিনি নিরঞ্জন বাবু।

ব্যাপার দেখিয়া নিরঞ্জন হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। আস্তে আস্তে কাছে আসিয়া উত্তরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এ খবর তো আমি জান্‌তে পারিনি উত্তরা!…

উত্তরা সর্ব্বাঙ্গ কাপড় মুড়ি দিয়া মৃত পিতার পায়ের কাছে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল, নিরঞ্জনের কথার জবাব দিতে পারিল না।

নিরঞ্জন কহিলেন—কবেই বা অসুখ হ'ল আর কখনই বা মৃত্যু হ'ল…

উত্তরা শুষ্ক চক্ষে চাহিয়া কহিল—অসুখ দু'তিন দিন।…আজ বেলা পাঁচটার সময় চলে গেছেন।

নিরঞ্জন হতবুদ্ধির মতই কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া, কহিলেন—শ্মশানে যাওয়ার লোক পাওনি বুঝি ?...ছিছি, আমায় একটা খবর দিতে হয়।

উত্তরা কহিল—দিতে পারিনি, সেজন্যে মাপ চাইছি।...কিন্তু সৎকারের জন্যে লোক ডাকৃতে গেছেন।

—কে ?

—তিনি মেডিকেল কলেজের হোষ্টেলে—

—নিরঞ্জন বুঝিলেন—সম্ভবতঃ কোন ডাক্তারের পরিচয়েই এইরূপ হোষ্টেলের সাহায্য পাইবার আশা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন—যে ডাক্তার চিকিৎসা করেছিলেন—

কথার মাঝখানেই উত্তরা বলিল—তাঁকেও খবর দেওয়া হবে বোধ হয়।...

নিরঞ্জন কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তার পর কহিলেন—তাহ'লে এক কাজ কোরো, শ্মশান থেকে ফিরে আসবার সময় এখানে না এসে, একেবারে ওবাড়ীতেই উঠো। অবিশ্যি আমিও শ্মশানে যাচ্ছি, সঙ্গে করেই তোমাকে নিয়ে যাবো...ফিরতে রাত্রি ভোর হ'য়ে যাবে।

উত্তরা একবার মাত্র জিজ্ঞাসা করিল—'কোন্ বাড়ীতে'। তারপর উত্তরের জন্য কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ না করিয়া, চোখে আঁচল চাপা দিয়া বসিয়া রহিল।

নিরঞ্জন কহিলেন—কাছে টাকাকড়ি আছে তো ? আমার কাছেও আপাততঃ বিশেষ কিছু নেই, তাহ'লে আবার বাড়ী যেতে হয়।...আমি আসচি কোথা ২৮শে তারিখেই শুভকাজ হবে কি না তাই জান্‌তে, আর এদিকে—

তীব্র বিরক্তির স্বরে উত্তরা বলিয়া উঠিল—এখনো আপনার সেই

আশাই আছে না কি ?...টাকাগুলো বাবার হাতে যা দিয়ে গেছলেন তার সবগুলোই চুরি গেছে, এবং তা একটু পরেই আপনাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি ; নিতে তো চাইনি আমরা, আপনি জোর করে দিয়ে গেছলেন।

নিরঞ্জন অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন—কিন্তু তোমার কি স্মরণ নেই উত্তরা, যে, পাকা-দেখা, আশীর্ব্বাদ সবই সেদিন শেষ হয়ে গেছলো ?

সহসা দুটি হাত যোড় করিয়া উত্তরা বলিল—আপনার পায়ে পড়ি—ভুলে যাবেন না যে, আজ আমি পিতৃহীনা—অনাথা।···এখনো আমার পিতার শবদেহ বিনা সৎকারে এখানে পড়ে রয়েচে।...

তারপর প্রবল বিতৃষ্ণার সহিত বার কতক বলিল—আশীর্ব্বাদ···পাকা দেখা...

নিরঞ্জন কহিল—যাক্, তোমার বিবেচনায় যা হয় তাই কোরো উত্তরা! কিন্তু মনে রেখো, ব্যবহার যেমনই দেখাও, আমি তোমার আত্মীয়, এবং চিরকালই তা থাক্‌বো।

উত্তরা বলিল—আপনাকে ধন্যবাদ!...আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করুন।...কিন্তু অন্তরকে ঠকিয়ে আমি কোন রকমেই আজ আপনার মতে মত দিতে পারলাম না।

নিরঞ্জন কহিল—কোথায় থাক্‌বে তবে? শুনেছিলাম মুখুয্যে মশায়ের আত্মীয় ব'লতে কেউ ছিল না।...চড়কডাঙ্গার গোবিন্দবাবুর ওখানে যাবে না তো ?

—তিনিও বেঁচে নেই।

—তবে ? আমি ছাড়া তোমার কে আছে উত্তরা ?

সহসা উত্তরা চিন্তাযুক্ত হইল।

নিরঞ্জন কহিলেন—ভাবাভাবির সময় নেই উত্তরা! যারা সৎকার করতে আসছে তাদের আসার পূর্ব্বেই সব ঠিক করতে হবে।...এখনো বিবেচনা করো।—

কাঁদ কাঁদ হইয়া উত্তরা বলিল—আপনার পায়ে পড়ি—আমাকে অনর্থক লুব্ধ করবার চেষ্টা করবেন না। আমার বাবার কাছেও এ অনুমতি চেয়ে নিয়েছি। তবে আপনার বাড়ী যেতে আমার কিছু মাত্র আপত্তি থাক্‌তো না, যদি আপনি আজ উপযুক্ত সম্পর্কের সম্মান আমাকে দিতে পারতেন।

অধীর আগ্রহে নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করিলেন—অদেয় আমার এখনো কি কিছু আছে উত্তরা? বলো কি সম্পর্কের দাবী তোমার?...

—আমাকে আপনি 'কন্যা' সম্বোধন করুন। যা সব চেয়ে, সব দিক্‌ থেকেই মানাবে আজ।

নিরঞ্জন কি বলিতে গিয়াই বাধা প্রাপ্ত হইলেন।

সহসা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল—প্রায় বারো তের জন যুবক,—সঙ্গে তাহাদের মনতোষ।

নিরঞ্জন বলিয়া উঠিল—এ-কে মনু...তুই এখানে!

মনতোষ নিরঞ্জনকে দেখিয়াই বিস্মিতভাবে বলিল—মামা বাবু!... আপনি...এখানে...

—কিন্তু তুই কি করে এদের চিন্‌লি?...আমার সঙ্গে অনেক আগেই চেনা-পরিচয় হ'য়েছিল।

সহসা পিতৃ-শোকের প্রচণ্ড আঘাত সহিয়াও উত্তরা নিরঞ্জনের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নিম্নকণ্ঠে কহিল—এখনো কি আমার সম্পর্কটা স্বীকার করবেন না?...এই ভাগ্‌নের সুমুখেও যদি আজ অবলা বধ করতে—

নিরঞ্জন ভয়ানক কুণ্ঠিত হইয়া আস্তে আস্তে বলিলেন—আর লজ্জা দিয়ো না উত্তরা !...যদি এতগুলো ছেলের সাম্‌নে আমায় পাগল সাব্যস্ত করতে ইচ্ছা না হ'য়ে থাকে,—তাহ'লে দয়া করে চুপ করো। বলিয়া মনতোষকে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—হাঁরে মনু ! মুখুয্যে মশায় তোকে চিন্‌তেন ?

মনতোষ কিছু না বলিতেই তাহার বন্ধুবর্গের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল—আপনি বুঝবেন না।...খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল, তাই দেখে মনুর মা, এই উত্তরার সঙ্গে ওর বিয়ের ঠিক-ঠাক্ করেছেন।

অবাক্-বিস্ময়ে নিরঞ্জন চাহিয়া রহিলেন। তারপর কহিলেন—ও, তাই বুঝি রাধানগরের সম্বন্ধটা ভেঙ্গে দেওয়া হ'ল ?...কিন্তু ব্যাপার জানো ?—এই খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনটা আমিই দিয়েছিলাম। বলিতে বলিতে অন্তরের মধ্যে একটা ব্যথা অনুভব করিলেন এবং সেটাকে সহিবার ক্ষমতা পাইতেও ভক্তিভাবে ভগবানকে প্রার্থনা জানাইলেন—শক্তি দাও পরমেশ্বর !...মনু আমার পুত্রের মতই স্নেহার্থী। তার মা আমার মাতৃতুল্যা—অগ্রজা।

লজ্জিত হইয়া উত্তরা হেঁট মুখে বসিয়া ছিল—নিরঞ্জন হঠাৎ তাহাকে বলিয়া উঠিলেন—আর ব'সে থেক না মা !...রাত দুপুর হ'য়ে গেছে।

উত্তরার ক্ষত-বিক্ষত বুকখানার পরতে পরতে কে যেন এক রাশ পুষ্প বর্ষণ করিল। সে সর্ব্বপ্রথমে, উঠিয়াই নিরঞ্জনের পদধূলি লইয়া আপন মস্তকে দিল। সকলে ভিতরের ব্যাপার না বুঝিলেও দেখিয়া কেহ বিস্মিত হইল না।

বহুকণ্ঠের হরিধ্বনি ও উত্তরার কাতর কণ্ঠের হাহা-রব—একসঙ্গে মিশিতে মিশিতে রঘুনন্দনের নশ্বর দেহ সৎকারার্থ শ্মশান-পথে চলিল।

* * * *

নির্দ্দিষ্ট দিনে, আড়ম্বরবিহীন হইলেও, বেশ সুশৃঙ্খলায় ও সুসংযত ভাবে মনতোষের সাহায্যে উত্তরা পিতৃশ্রাদ্ধ শেষ করিল। নিরঞ্জন স্বয়ং হাজির থাকিয়া তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন।

শ্রাদ্ধের চার-পাঁচ দিন পূর্ব্বে মনতোষ কলিকাতার বাগবাজার অঞ্চলে নাতিবৃহৎ একখানি বাড়ী ভাড়া লইয়াছিল।...এখন সেই বাড়ীতেই উত্তরা বাস করিতেছে।

* * * মনতোষ মাতার জরুরী পত্র পাইয়াছে—উত্তরাকে শীঘ্রই দেশের বাড়ীতে রাখিয়া আসিতে হইবে। কিন্তু কলেজে পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ায়, যাওয়ার দিন বাধ্য হইয়া তাহাকে পিছাইয়া দিতে হইয়াছে।

কলেজে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আধঘণ্টা পূর্ব্বে সে উত্তরার কাছে বসিয়া আহার করে, এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফিরিয়া জলযোগ করে, রাত্রে আহারও করে। স্নেহের বিপুলতায় মনতোষের বুক কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে।...ভালবাসার দুকূল-প্লাবিত বন্যা দুই বক্ষের ব্যবধান ভাঙ্গিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া ছুটিয়াছিল।

...পরীক্ষা শেষ হইবার একদিন আগে, সন্ধ্যার পূর্ব্বে জলযোগ করিতে বসিয়া, ঘোলের সরবতের গ্লাসটী মুখে তুলিতে তুলিতে মনতোষ বলিল—মায়ের চিঠিখানা পড়েছ উত্তরা?—আজকের খানা?

উত্তরা হাসিয়া বলিল—বেশ মজার লোক তুমি,—আমার নামে চিঠি এলো—আর আমি তা পড়বো না?

হাসিয়া মনতোষ কহিল—কি লিখেছেন জানো তো?

উত্তরা কপট ক্রোধের সুরে বলিল—বেশ যাও!—ওসব তো আমায় লেখেন নি,—তোমাকে।

মনতোষ বলিল—যাকেই লিখুন, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে মাতৃ-আজ্ঞা পালন করে যাবো,—কি বলো?…২৮শে দিনে দৈবের বশে হয়নি, অবশ্য সেটা সৌভাগ্যই বলতে হবে। এবার কিন্তু নির্দ্দিষ্ট তারিখের পূর্ব্বেই বাড়ী পৌঁছে যাবো।…তারপর মায়ের আদেশমত দুজনেই দুজনকে বেঁধে—উঃ কি আনন্দই হচ্ছে!

উত্তরা হাসিতে হাসিতেও ক্রোধ দেখাইয়া বলিল—ভাল হ'বে না ব'লে দিচ্ছি!…বলিয়া মনতোষের গায়ে ধাক্কা দিল।

মনতোষ হাসিয়া, ধাক্কা দেওয়া স্থানে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—আঃ! তোমার হাতটা কি মিষ্টি উত্তরা!…ভা-রি আরাম হ'ল কিন্তু!

উত্তরা কট্‌মট্ করিয়া মনতোষের মুখপানে চাহিতেই, মনতোষ জোরে হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিল—ভগবানের শপথ ক'রে বলছি উত্তরা!—এ দৃষ্টির তুলনা নেই!

নবম পরিচ্ছেদ

পরীক্ষা শেষ হইয়া গেছে।

মনতোষ দেশে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। হাট-বাজার সুরু হইয়া গেছে। দু'দিনের মধ্যে না হবে পাঁচশো টাকার জিনিষপত্র খরিদ হইয়া গেল। আরো কিনিতে হইবে।—মনতোষ যখন-তখন ব্যস্ততা দেখাইয়া বলে,—সময় নেই, জিনিসপত্র এখনো সব কেনা হ'ল না! কখন যে কি করি!

উত্তরা মাঝে মাঝে মুখ টিপিয়া হাসে। বলে—এক কাজ করো, খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দাও,—কত টাকা হ'লে সমস্ত কলকাতা সহরটায় যত জিনিষ আছে সব খরিদ করা যায়,—তার ফর্দ্দ দিবার জন্য একজন পাকা ওস্তাদ্ লোক পাওয়া যাবে!…তুমি পাগল না কি?

মনতোষও হাসে! বলে—বিজ্ঞাপনই দেব উত্তরা!—বিজ্ঞাপনের—পরেই তো আমি রাত-দুপুরে পথের মাঝে মানিক কুড়িয়ে পেয়েছিলাম! বিজ্ঞাপনই আমার লক্ষ্মী। কিন্তু তোমার নামেও এর সঙ্গে একটা বিজ্ঞাপন পাঠিয়ে দিচ্ছি—

—আমার নামে?—আমার অপরাধ?—

—ও, বিজ্ঞাপন দেওয়াটা বুঝি মহা অপরাধের কাজ? তোমার নামে লিখে দেব কি জানো?

—কিছু লিখে দিতে হবে না।

—আরে—শোনোই না—

—শুনতে আমি চাইনে। পাগলের পাগ্‌লামি শোনবার সময় নেই আমার।

মনতোষ উত্তরার আঁচল ধরিয়া যতই টান দেয়, উত্তরা ততই অগ্রসর হইবার চেষ্টা করে।

—শোনো না—কি লিখ্‌বো জানো?—লিখবো—নং বাগবাজার স্ট্রীটে আসিলেই মানুষ বশ করিবার ঔষধ মিলিবে। নমুনার জন্য যে কোনো দিন আসতে পারেন।—সময়—কোন্ সময় লিখবো না?

কপট ক্রোধের ভাব দেখাইতে গিয়া প্রবল হর্ষাতিশয্যটুকু উত্তরা কোনো রকমেই চাপিয়া রাখিতে পারিল না।

বলিল—দেখ,—অমনিতর বাজে কথা যদি বলো,—সত্যি বলছি, তোমার মার কাছে চিঠি লিখ্‌বো। আজই লিখ্‌বো।

—কি লিখ্‌বে?

উত্তরা সহসা লজ্জিত হইয়া পড়িল। ওর স্থলপদ্মের মত মুখখানায় প্রভাতের সোনালি আলোর পরশ লাগিয়াছে!

—বলো না?—কি লিখ্‌বে মা'র কাছে?

উত্তরা মুখ নীচু করিয়া বলিল—লিখ্‌বো—পাগলের সঙ্গে বিয়ে আমি করবো না।

মনতোষের হাসি আর থামিতে চায় না! সে কী উচ্ছ্বসিত আনন্দ!

উত্তরাও হাসিতে লাগিল। কহিল—আঃ—কী করছো? রাস্তায় এতক্ষণ লোক জড়ো হ'য়ে গেছে!

মনতোষ আরো জোরে হাসিয়া উঠিল।